IBCA
JAPAN

আগমনী ২০২৫

AGOMONI 2025

ত্রয়োদশ সংস্করণ

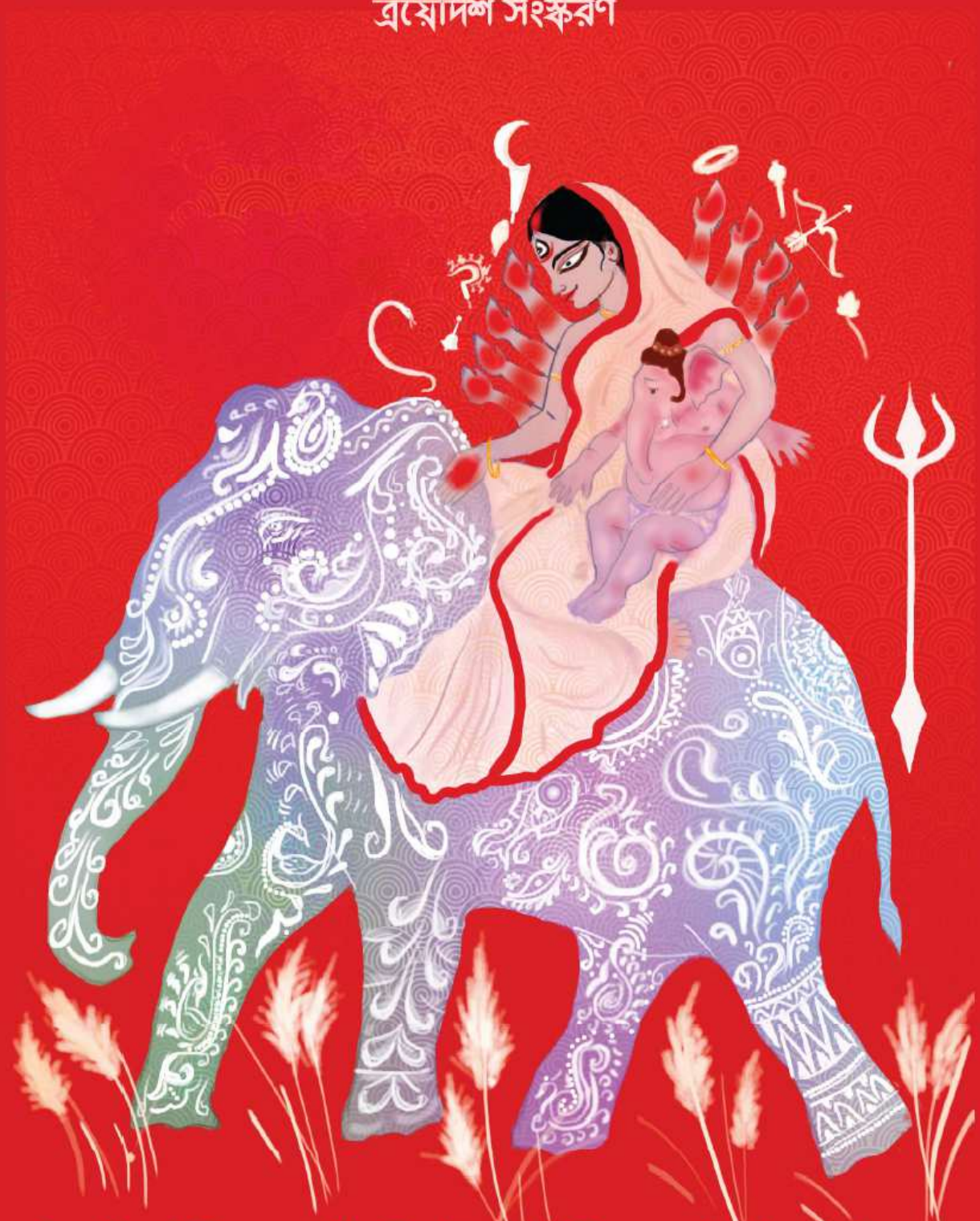

India (Bengal) Cultural Association Japan

AGOMONI 2025

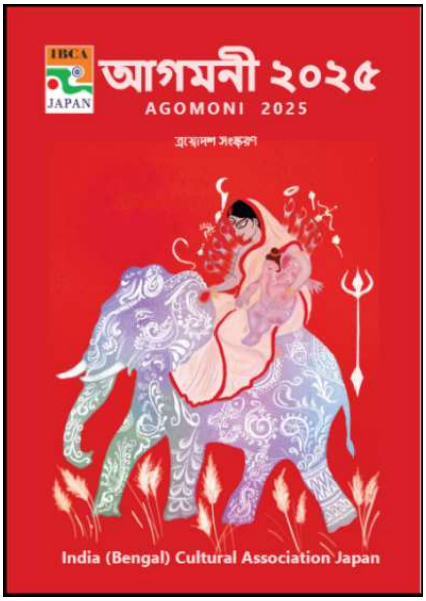

TEAM AGOMONI

Editing and Design :

Subhasis Pramanik
Sukanya Misra
Bhaskar Dasgupta
Kaustav Bhattacharyya
Suchhando Chatterjee
Biplab Chakraborty
Sudipta Das

Cover page design :

Nabarun Roy

সবারে করি আহ্বান

Previous Publications by IBCAJ

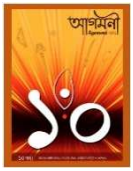

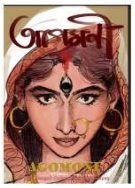

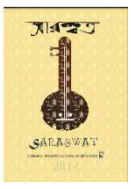

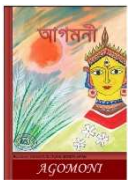

অনুষ্ঠান সূচী

পূজা : ১১টা ~

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান: ১২টা -১৩টা

প্রসাদ বিতরণ : ১৩টা - ১৪টা ৩০

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ১৪টা ৩০ - ১৭টা

আরতি : ১৭টা - ১৮টা

Program

Puja: 11:00 onwards

Floral offering: 12.00 - 13.00

Lunch (Prasad offering): 13.00 - 14.30

Cultural Program: 14.30 – 17.00

Aarati: 17.00 – 18.00

Cultural Program Attractions:

- *Screen Queens of Bengal*
- *Bengali Drama enacted by IBCAJ members*
- *Raffle Draw*

Financial statement of IBCAJ Durga Puja 2024

Income	Amt (JPY)	Expenditure	Amt (JPY)
Subscriptions from guests and members	976,000	Puja hall rent and other related expenses	80,675
Sponsorship income	386,525	Expenses for food and refreshments	540,708
Collection at donation box	51,000	Transportation	44,488
		Cultural program related expenses	39,180
		Magazine printing	173,116
		Media and publicity	5,000
		Misclleneous expenses	94,643
		Surplus	435,715
Total	**1,413,525**		**1,413,525**

সম্পাদকীয়

শরৎ এসেছে। কাশফুলের শুভ্র হাসি, নীল আকাশের প্রশান্তি, আর বাতাসে ছড়িয়ে পড়া এক চেনা উত্তেজনা—সব মিলিয়ে বাংলার হৃদয় আবার জেগে উঠেছে। মা আসছেন। আর সেই আগমনী বার্তা নিয়ে আগমনী-র ত্রয়োদশ সংখ্যাও এসেছে আপনাদের কাছে।

ত্রয়োদশ। এই সংখ্যা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি আমাদের যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আগমনী জন্ম নিয়েছিল এক স্বপ্ন থেকে—একটি এমন পত্রিকা, যা শুধু তথ্য নয়, অনুভব বহন করবে। এই দীর্ঘ পথচলায় আমরা দেখেছি পাঠকের চোখে উৎসবের রঙ, শিল্পীর তুলিতে সংস্কৃতির ছোঁয়া, আর লেখকের কলমে হৃদয়ের গল্প। আজ, এই ত্রয়োদশ সংখ্যায় দাঁড়িয়ে, আমরা অনুভব করি—এই পত্রিকাটি আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের অংশগ্রহণে, আপনাদের স্মৃতিতে বেঁচে আছে।

তবে এই উৎসবের আবহে, আমরা এক পরিবর্তনশীল সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধের ছায়া, এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েন আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে। জ্বালানি থেকে খাদ্যদ্রব্য—প্রায় প্রতিটি জিনিসের দাম বেড়েছে। সাধারণ মানুষের চিন্তা বেড়েছে। জাপানের মতো দেশ, যেখানে যেখানে আমরা সবাই বসবাস করি, সেখানে জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তন শুধু পরিসংখ্যান নয়, এটি সমাজের কাঠামো, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে।

এই বাস্তবতা আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করলেও, দুর্গোৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আলো এখনও আছে, আশাও আছে। মা দুর্গার আগমন যেন এক প্রতীক—অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর, সংকটের বিরুদ্ধে সাহসের, আর বিভাজনের বিরুদ্ধে সংহতির। প্রতিমার চোখে যেন দেখা যায় আমাদের আশা, প্যান্ডেলের আলোয় যেন জ্বলে ওঠে আমাদের স্বপ্ন, আর ঢাকের তালে যেন বাজে আমাদের অন্তরের উচ্ছ্বাস।

এই উৎসব আমাদের শেখায়—ভয়কে জয় করার সাহস, বিভাজনকে অতিক্রম করার শক্তি, আর প্রতিদিনের ক্লান্তির মধ্যেও আনন্দ খুঁজে নেওয়ার ক্ষমতা। এটি আমাদের শিকড়ের সঙ্গে এক গভীর সংযোগ তৈরি করে—যেখানে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের চ্যালেঞ্জ, আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা একত্রিত হয়।

এই সংখ্যাটি সেই চেতনারই এক প্রতিফলন। আগমনী চায় আপনাদের সঙ্গে একসাথে হাঁটতে—স্মৃতির পথে, সংস্কৃতির ছায়ায়, আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি পাঠক এই পত্রিকার পাতায় নিজের একটি অংশ খুঁজে পাবেন—হয়তো এক পুরনো গল্প, হয়তো এক নতুন ভাবনা, হয়তো এক চেনা অনুভূতি।

ত্রয়োদশ সংখ্যার এই যাত্রায় আমরা আপনাদের পাশে চাই। কারণ আগমনী শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি একটি সম্পর্ক—ভাষার, সংস্কৃতির, আর হৃদয়ের। এই সম্পর্কই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে—উৎসবের আলোয়, সংকটের মধ্যেও আশার পথে।

“আকাশ বাতাস আনমনা আজ
শুনে এ কোন ধ্বনি,
চিরনতুন হয়েও অচিন
এ কার আগমনী।” - প্রেমেন্দ্র মিত্র

এই ধ্বনি, এই অচিন আগমনী, আমাদের হৃদয়ে জাগায় নব আশার দীপ্তি। শুভ দুর্গোৎসব।

भारत के राजदूत
AMBASSADOR OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजदूतावास
Embassy of India
2-2-11 Kudan Minami, Chiyoda-ku
Tokyo 1020074

MESSAGE

On the auspicious occasion of Durga Puja, I extend my warmest greetings to all members of the Indian community in Japan, friends of India, and well-wishers.

Durga Puja is not only a celebration of the victory of good over evil, but also a festival that brings people together in devotion, culture, and shared joy. It is a time to honor the divine feminine power, Shakti, which inspires us to overcome challenges with courage, compassion, and resilience.

I commend the Indian Cultural Association for its efforts in organizing this celebration and for keeping our rich traditions alive here in Japan. Festivals such as these strengthen the bonds within our community and also serve as a bridge of friendship with our Japanese friends, who deeply appreciate India's cultural heritage.

I also extend my wishes to India (Bengal) Cultural Association Japan for bringing out its **Annual Magazine Agomoni**, which provides a wonderful platform to the community for literary expression.

As we celebrate with devotion, music, dance, and joy, let us also reflect on the values of harmony, unity, and respect that this festival embodies. May Goddess Durga bless us all with peace, prosperity, and happiness.

May this festival bring joy, prosperity, and peace to everyone.

Wishing you all a very Happy Durga Puja!

(Sibi George)

Tokyo
8 September 2025

Telephone: +81-3-3265-5036; Fax: +81-3-3262-2301; E-mail: amb.tokyo@mea.gov.in; amboffice.tokyo@mea.gov.in

From the President`s Desk

Another year has just passed by, and once again it is the time to celebrate the Bengalis' biggest festival – Durga Puja. We are truly proud to have continued this celebration for 14 consecutive years in one of the busiest cities in the world. This has been possible only because of the collective strength of our members, their cooperation, and their absolute dedication toward IBCAJ.

This year marks our fourteenth Durga Puja and the thirteenth edition of Agomoni, which began its journey in 2013. Each year has added a new chapter to our shared history, and today IBCAJ stands as a thriving organization of more than 40 families, grown from the humble beginning of just 15 families. This growth has been possible because we always worked together without discrimination, without show of position or title, but with mutual respect and as companions in one family. That spirit of unity is the very essence of IBCAJ, and we must uphold it for the future.

In recent times, the number of Durga Pujas in Tokyo and nearby areas has grown significantly. While at first it might seem to reflect division or competition, in reality it strengthens our common purpose. The more celebrations are organized, the more opportunities arise to spread Bengali culture and values in Japan. For IBCAJ, our mission has always been unique – not only to celebrate Bengali traditions but also to share our literature and culture with the Japanese community, while simultaneously helping newly arrived Bengalis and other Indians to integrate and thrive here.

I sincerely thank our magazine team, cultural team, and social media team for their tireless efforts over the last several months. Your dedication has helped us reach both Indian and Japanese communities across the country. My heartfelt gratitude also goes to The Embassy of India in Japan for their constant support and encouragement, and to our sponsors for standing firmly with us on this journey.

On this auspicious occasion of Durga Puja, let us forget our pains, sorrows, pride, and arrogance, and come together to strengthen our bond of unity and integrity. Let us pray to Ma Durga to bless us all with good health, peace, and prosperity in the days ahead.

HAPPY DURGA PUJA to all of you.

With love and gratitude,
Swapan Biswas
President, IBCAJ
Date: 28th September, 2025,
Tokyo, Japan

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

বেতারে মহিষাসুর মর্দিনী ও তার বিশ্বায়ন	~সুপ্রিয় সেনগুপ্ত	7-9
সানকেইএন বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ	~প্রবীর বিকাশ সরকার	11-13
টমি	~স্বর্ণাভ বেরা	15-16
When Ma Durga Visited Tokyo	~Kundan Das	17
The Last Stand: A Tale from Kargil	~Sudipto Saha	21-24
অনুভূতি	~কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য	27-29
Inakadate: The Savior Rice Art	~Sugam Ghosh	31-34
কপাল	~উদয় চক্রবর্ত্তী	35-37
প্রহেলিকা	~এনাক্ষী মিশ্র	42-45
Zen: The Union of Two	~Ankita Sen, Jeet Biswas	47-48
সোনা রোদের গান	~ড. সোমা মুখোপাধ্যায়	49-51
ওবাআচান	~অনুরাগ ঘোষ	52-53
Celebrating Five Glorious Years of Durga Puja with ICCHE	~Krishnendu Laha	54
ব্রহ্মমুহূর্তে পিতার মৃত আত্মার দর্শন এবং ব্রহ্মমুহূর্তের কার্যকারীতা	~পার্থপ্রতিম ব্যানার্জী	57-62

কবিতা

এই শরতে	~দীপক বেরা	10
আগমনী গান	~ড. সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	10
বনের ফুলের মালী	~সৌভিক সরদার	18
মৃন্ময়ীকথা	~অর্চিস্মিতা মিশ্র	18
বাপ সোহাগী	~কল্পনা চক্রবর্ত্তী	38
অজরা অতুলা	~কেয়া ভট্টাচার্য্য	38
শরতের আবাহন	~অশোক কুমার দাস	38
Hindi Translation of Rabindranath Tagore's Poem প্রতীক্ষা	~Nitin Srivastava	39

পেন্টিং এবং ফটোগ্রাফি

কল্যান হালদার (P10), দেবস্মিতা বিশ্বাস(P15), মৌমিতা মুখার্জী (P17,P18), রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় (P19), ড. সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (P24), কেয়া ভট্টাচার্য্য (P27), মৌমিতা রায়চৌধুরী (P38), ধ্রুপদ চ্যাটার্জী (P41), হিমাংশু ব্যানার্জী (P41), দুর্জয় বিশ্বাস (P41), অগ্নিমিত্রা সাহা (P41), সুকন্যা মিশ্র (P42), পৌষুমী ঘোষ(P51,P52), দেবরাজ বিশ্বাস(P51), আয়ুষ্মিত বিশ্বাস(P51), স্নেহিত মুখার্জী(P51)

হেঁশেল থেকে

শক্তপোক্ত শুক্তো ~মৌসুমী বিশ্বাস(P63)
ক্ষীর সেমুই ঝুড়ি ~উর্মিতা পায়রা (P63)
নল্লি নিহারি ~পৌলমী ঘোষ(P64-65)

বিশেষ আকর্ষণ

Haiku (俳句)
P55-56

বেতারে মহিষাসুর মর্দিনী ও তার বিশ্বায়ন

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত

১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল ভারতীয় বেতারের সরকারিকরণের পর নাম হয় "ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস"।

তখন সকলেই নব নব অনুষ্ঠান সাজাতে ব্যস্ত। এরই ফলে জন্ম নিল 'বেতার-বিচিত্রা'। রচনা থেকে পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার বাণীকুমারের উপরেই ন্যস্ত হল। এই সৃজনশীল মানুষটি বিভিন্ন স্বাদের ডালি সাজিয়ে ফেললেন, তার প্রথম ডালিটি হচ্ছে "বসন্তেশ্বরী"। সঙ্গীত পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বালীর সুর-মূর্ছনায় "রাগ বসন্ত" এবং দেশী, দেবগিরি, বরাটী, তোড়ী, ললিত ও হিন্দোলী— এই ছয় রাগিনী বাণী-সংযোগে এক অপূর্ব রসের সঞ্চার হয়। পঙ্কজকুমার মল্লিক অন্যান্য গানের সুর দেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কয়েকটি নাট্য-কথা সূত্র ও গীতাংশ পাঠ করেন এবং বাণীকুমার শ্রীশ্রীচণ্ডীর কতিপয় শ্লোক আবৃত্তি করেন। রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গীত পরিচালনায় ও বাণীকুমারের প্রবর্তনায় অনুষ্ঠানটি রসোর্ত্তীর্ণ হয়। এই অনুষ্ঠানটিই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে 'মহিষাসুরমর্দিনী' পরিকল্পনার উৎস।

এই "বসন্তেশ্বরী" অনুষ্ঠানটি রসোত্তীর্ণের কিছু দিন বাদে বাণীকুমার তৎকালীন বেতার অধিকর্তা শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে গিয়ে ১৯৩২-এর মহাষষ্ঠীর (আশ্বিন ১৩৩৯) শারদীয়া বন্দনা করার বাসনা রাখেন। কিন্তু , পর পর এই অনুষ্ঠান শ্রোতারা গ্রহণ করবে না বলে এই অনুষ্ঠানটি করতে আগ্রহী ছিলেন না নৃপেন্দ্রনাথ বাবু । এই রকম আলোচনা যখন চলছে তখন বেতার জগতের সম্পাদক প্রেমাঙ্কশু আতর্থী এসে বাণীকুমারের এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং নৃপেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে এই অনুষ্ঠান ওই নির্দিষ্ট দিনেই সম্প্রচার করবার ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ মহাষষ্ঠীর নবপ্রভাতে বাণীকুমারের রচিত 'শারদীয়া বন্দনা' তাঁরই প্রবর্তনা। শ্রী পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীত পরিচালনা এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গ্রন্থনা ও স্তোত্র পাঠে এটি প্রচারিত হল এবং শ্রোতাদের মন জয় করল। ১৯৩৩, ১৯৩৪, ১৯৩৫ — এই তিন বছর পরিমার্জিত হতে থাকে স্ক্রিপ্ট , কিন্তু ওই একই নামে প্রচারিতও হতে হতে থাকে। তার পর ১৯৩৬ সালে "মহিষাসুর বধ" এবং ঠিক পরের বছর ১৯৩৭ সাল থেকে "মহিষাসুরমর্দিনী" নামকরণ হয়।

এইবার বাণীকুমারের কথা শোনা যাক—

"মহিষাসুরমর্দিনী সম্পর্কে সহৃদয় গ্রাহকগণের অবগতির জন্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বৎসরে বৎসরে না হোক্— এই মহিষাসুরমর্দিনী আলোখ্যটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবার আগ্রহে আমি বিবিধ বিষয়, স্তব-স্তুতি, দেবীসুক্ত, নব-রচিত গান সন্নিবেশ করেছি। অন্ততঃ

ছয়-সাত বার এই রচনার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মহাদেবীর চণ্ডিকার প্রায় সমূহ তত্ত্ব ও তথ্য সমাহারে এবং দেবীর নানাবিধ ভাব-রূপ-প্রকাশক গীতাবলী-সজ্জায় এই 'মহিষাসুরমর্দিনী' সুসম্পন্না হয়ে উঠেছে।"

মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক হলেও 'অখিল বিমানে', 'আলোকের গানে'- এই গানগুলির সুর দেন হরিশ্চন্দ্র বালী। 'শান্তি দিলে ভরি'র সুর দেন সাগির খাঁ।

বর্তমান রেকর্ডে আমরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের যে ধরনের চণ্ডীপাঠ শুনি, প্রথম দিকে কিন্তু উনি ওই ভাবে উচ্চারণ করতেন না। পুরো দলটিকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ মহাশয়।
ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকে এই অনুষ্ঠান। আর হবে নাই বা কেন, প্রচুর গুণী মানুষের সমাবেশ, তাঁদের আলোচনা, নতুন কিছু করার অদম্য চেষ্টা এবং বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠা তাঁদের এই অনুষ্ঠানকে শ্রোতাসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই অনুষ্ঠানের শুরুর দিকের গায়কেরা ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণ ঘোষ, আভাবতী, মানিকমালা, প্রফুল্লবালা, বীণাপাণি প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় যেমন হয়েছিল তেমনি এটিকে ঘিরে একটি বিতর্ক তুলেছিলেন তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণসমাজ। তাঁরা বলেছিলেন, পুণ্য মহালয়ার ভোরে অব্রাহ্মণের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনানোর কোনও যৌক্তিকতা নেই। এই ঘটনার পর অনুষ্ঠানটিকে সরিয়ে ষষ্ঠীর ভোরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শ্রোতাদের বিপুল চাপে ১৯৩৬ সাল থেকে পুনরায় অনুষ্ঠানটিকে মহালয়া তিথিতেই বাজানো শুরু হয়।
এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক শিল্পীর অনুষ্ঠানটির সঙ্গে একাত্মতা ছিল দেখবার মতো। লাইভ সম্প্রচারের সময় সমস্ত কলাকুশলী ভোররাতে স্নান সেরে শুদ্ধ আচারে উপস্থিত হয়ে যেতেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পরতেন গরদের জোড়, কপালে চন্দনের ফোঁটা।
এই ভাবে যখন অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে, সেইসময় ১৯৭৬ সালে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানটি বাতিল করে একটি অন্য অনুষ্ঠান বাজানো হবে মহালয়া তিথিতে। এই অনুষ্ঠানটির নাম 'দেবীদুর্গতিহারিণীম্'। এটি লিখেছিলেন ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গান লিখেছিলেন শ্যামল গুপ্ত। নির্বাচিত কিছু ভাষ্যপাঠ করেছিলেন মহানায়ক উত্তমকুমার।

কিন্তু এ অনুষ্ঠান দর্শকেরা একেবারেই গ্রহণ করেননি। 'মহিষাসুরমর্দিনী'কে বাদ দেওয়ার জন্য ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল সাধারণ মানুষ। তৎকালীন আকাশবাণীর জনপ্রিয় উপস্থাপক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'দেবীদুর্গতিহারিণীম্' অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের মধ্যপথেই টেলিফোনে শ্রোতাদের অবর্ণনীয় গালিগালাজ আসতে শুরু করে অকথ্য ভাষায়। অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই আকাশবাণী ভবনের সামনে সমবেত হয় বিশাল জনতা।

ফটকে নিয়োজিত প্রহরীরা সামাল দিতে হিমশিম খেয়ে যান। ফটকের গেট ভেঙে ঢুকে পড়তে চায় উত্তাল মানুষের দল'। শোনা যায়, পরবর্তী কালে উত্তমকুমারও তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন।
এই ভাবে মহিষাসুরমর্দিনীকে সরিয়ে দেওয়ায় মর্মাহত হয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক। একটা অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের কী রকম ভালবাসা থাকলে এ রকম প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সে বছর ষষ্ঠীর দিন এ অনুষ্ঠান আবার বাজানো হয় এবং ১৯৭৭ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত মহালয়ার ভোরেই বাজানো হয় 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি।
কিন্তু যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের উদাত্ত কণ্ঠের জাদুতে এই অনুষ্ঠান এখনও পর্যন্ত স্বমহিমায় জীবিত সেই মানুষ টিকে শেষজীবনে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। আকাশবাণীকে নিজের সন্তানের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন উনি। নাটক প্রযোজনা, অভিনয়, গানের অনুষ্ঠান, চাষবাসের অনুষ্ঠান— সবরকম অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন সমান সাবলীল। এমনকি, বেতার পাক্ষিক পত্রিকা 'বেতার জগত' এর কপি তিনি জিপিও'র সামনে দাঁড়িয়ে নিজে হাতে বিক্রি করেছেন। শ্রীবীরুপাক্ষ ছদ্মনামে লিখেছেন অনেক লেখা। এহেন প্রবাদপ্রতিম মানুষটি

অবসরের পরও ‘সাপ্তাহিক মহাভারত পাঠ’ এবং ‘মজদুর মণ্ডলীর আসর’ এ আসতেন। এসময় এক দিন আকাশবাণীর জনৈক দ্বাররক্ষী তাঁর কাছে পাস চেয়ে বসেন। সে দিন প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে ক্রোধে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন তিনি। চিৎকার করে বলতে থাকেন, ‘‘এই রেডিও’কে জন্ম দিয়েছি আমি, আমার কাছে অনুমতিপত্র চাইছ!’’

সত্যিই তো, আকাশবাণী কর্মীরা তো এখনও এই নামটিকে (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র) পুজো করেন। অথচ অন্যত্র কত অনালোচিত তিনি! তাঁর এই অনুষ্ঠানটির শর্ত অবলীলায় বিক্রি হয়ে যায় কোনও এক রেকর্ড কোম্পানির কাছে। আকাশবাণীর নিজের সম্পদ আজ যেখানে ইচ্ছে যেমন ভাবে ইচ্ছে বাজানো হচ্ছে। দুপুরে রাস্তার ট্র্যাফিক সিগন্যালের মোড়ে কিংবা বিজ্ঞাপনের ‘ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক’-এ। কিছুতেই রেয়াত করা হচ্ছে না।

কিন্তু প্রতি বছর শিশিরে পা ভিজিয়ে বঙ্গে মহালয়ার যে পুণ্যপ্রভাত উপস্থিত হয়, সেখানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এখনও অমর হয়ে রয়েছেন। প্রতি বছর উনি কাঁদেন। আমাদের কাঁদান। বাঙালির জন্য দুর্গোৎসবের দরজাটাকে উনি হাট করে খুলে দেন। অপমানের আওয়াজগুলোকে ঢাক আর কাঁসরের আওয়াজ দিয়ে ঢেকে রাখেন।

বাঙালির মননে ও সত্তায় মহালয়ার সকালে অনুরণিত হয় 'বাজল তোমার আলোর বেণু'। এই দিনেই শুরু হয় পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা। একই দিনে বাঙালি তর্পণের মাধ্যমে পিতৃপুরুষদের স্মরণ করেন। পুরাণ মতে, এই দিনেই দেবী দুর্গা স্বর্গলোকের উদ্ধারে

মহিষাসুর বধের গুরুদায়িত্ব নেন। আসলে অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তি প্রতিষ্ঠায় এই দিনেই মা দুর্গার যাত্রা শুরু। ফলাফল প্রত্যাশিত হলেও দিনটি শোকের বলেছেন অনেকেই। তারপরও বাঙালির হৃদয়ে শোক নয়, বরং পুজো প্রস্তুতির দিগনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছে এই মহালয়া। তাই মহালয়া বাঙালির কাছে আবেগের, অনুভূতির, পুরাতন স্মৃতি রোমন্থনের দিনযাপন।

এই মহালয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'আকাশবাণী', জড়িয়ে আছে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। মহালয়ার সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে...' শুনলেই পুজোর অনুভূতি জাগ্রত হয়। মনে হয় পুজো ...এসেই গেল ।

এই অমর সৃষ্টি ছাড়া বাংলার আর বাঙালীর জীবন,বাঙালীর মনন বাঙালীর শারদ উৎসব অসম্পূর্ন থেকে যাবে চিরকাল। একেই বলে কালজয়ী সৃষ্টি । এই গাঁথা দেবী দুর্গার জন্ম, অস্ত্রলাভ, মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ ও বিজয় বর্ণনা করে — এক অপূর্ব বর্ণময় কল্পচিত্রের মতো।

এই অনুষ্ঠান অতি পরিচিত হয়েও বৎসরান্তে মহালয়ার শারদ ঊষার প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠানটি লক্ষ লক্ষ শ্রোতার মনকে আজও ভরিয়ে তোলে। এই মহাশক্তি-বন্দনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গেছে।

তাই,বেতারে মহিষাসুরমর্দিনীই আসলে বাঙ্গালি মননে প্রকৃত অর্থে “মায়ের আগমনী” ।

এই শরতে

দীপক বেরা

এই শরতে কি বা দিতে পারি?
হ্যাঁ, দিতে পারি এক টুকরো শারদীয়া।
অনুবাদে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে
পুজোর গন্ধে নিখাদ অন্বেষণ।
শরতের স্ক্রিন থেকে পুরোনো অভ্যেসে
খুঁটে আনি অন্যমনস্ক অভিসার। কে তাকে
বুক পেতে দেবে, কে দেবে জাফরান খোয়াইশ।
অভাবের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়
আকাঙ্ক্ষার তীব্র আলফাজ, নিঃশব্দ
ডুবে যাওয়া। মাটি তাকে ওম দেয়, সুর দেয়।
মহালয়ার শেষরাতে প্রসব দরজা খুলে
নিষ্ক্রান্ত জীবনের পথরেখায় এ জীবন
সনাক্ত করে বাঙালির সবটুকু জাগরণ
অমর পল-অণুপল জন্ম-জন্মান্তর
শরতে দুগ্গা মায়ের মুখ—আগমনীর সুরে
বাঁশি বাজে তার অনন্ত মূর্ছনায়.

আগমনী গান

ড. সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির সংস্কৃতি, আনন্দ সব দুর্গোৎসবকে ঘিরে,
আগমনীর তখন মর্ত্যে প্রবেশ স্বপ্ন ফুরায় ধীরে।
ভোরবেলার সোনারোদে শিউলির গন্ধ মেশে,
উৎসবের শুরু মহালয়ায় পিতৃ পক্ষের শেষে।
শিশির ভেজা ঘাস বিছিয়ে প্রকৃতি ঐ ডাকে,
মায়ের পায়ের নূপুর ধ্বনি কাশবনের ফাঁকে ফাঁকে,
সাদা মেঘের আলপনা আঁকা আকাশের ক্যানভাসে,
মা দূর্গা আসেন ধরায় প্রকৃতির নবীন উচ্ছ্বাসে।
মা উমা এসে চারদিন করেন ধরায় বসবাস,
অসুর- রূপী মানবের করেন সমূলে সর্বনাশ।।

ফটোগ্রাফি : কল্যান হালদার

সানকেইএন বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ

প্রবীর বিকাশ সরকার

জাপানব্যাপী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত স্থান আদৌ কম নয়। এদের মধ্যে সানকেইএন বাগানবাড়ি অন্যতম প্রধান। ১৯৯৯ সালের শীতকালে কানাগাওয়া-প্রদেশের য়োকোহামা বন্দরনগরীর হোমমোকু সাননোতানি নামক স্থানে অবস্থিত উক্ত বাগানবাড়িটি আবিষ্কার করি। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই সানকেইএন দেশ-বিদেশে সুবিদিত কারণ বিভিন্ন সময়ে দেশি-বিদেশি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে অবস্থান করেছেন। জাপানের সর্বমান্য সম্রাট-সম্রাজ্ঞী কর্তৃক এই বাগানবাড়িটি পরিদর্শন করার আলোকচিত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। সারা বছরই বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসব এবং সেমিনার লেগেই আছে। কাজেই প্রতিদিনই বিভিন্ন জেলা এবং বিদেশ থেকে পর্যটকরা এসে ভীড় করেন। এমনই জনপ্রিয় একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ।

টোকিও উপসাগর সংলগ্ন তিনটি উপত্যকা (সান নো তানি) ঘেরা বিশাল জায়গাটিতে দৃষ্টিনন্দন এই বাগানবাড়িটি নির্মাণ করেন মেইজি-তাইশোও যুগের প্রখ্যাত সিল্ক ব্যবসায়ী হারা মোমিতারোও (১৮৬৯-১৯৩৯) ১৯০২ সালে। ব্যবসায়ী হলেও তোমিতারোও ছিলেন গভীরভাবে স্বাদেশিক। জাপানি লোককলা ও ঐতিহ্যকে লালন এবং সাধারণ জাপানিদের মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ঐতিহ্যানুসারে চা-গৃহ, মন্দির, অতিথিভবন, বিশ্রামঘর, বাসভবন, পুরনো রীতির কাঠের বাড়ি, শিল্পকলা সংগ্রহশালা ইত্যাদি নির্মাণ করেন। সুবিশাল পাহাড়ি বাগানবাড়িটির সর্বপ্রাঙ্গণ ঝোপঝাড়, বন এবং পাইন, ম্যাপল্, সিডার, উমে, বাঁশ ও বিভিন্ন প্রজাতির সাকুরাসহ অজস্র বৃক্ষরাজির তলে-তলে, আড়ালে-আড়ালে প্রায় ২৮টি স্থাপনা প্রকৃত জাপানকে ছবির মতোই উপস্থাপিত করে রেখেছে। প্রত্যেকটি গৃহের রয়েছে এক-একটি নাম। উদ্যানটি বহিরাঙ্গন এবং অন্দরাঙ্গন দুভাগে বিভক্ত। বহিরাঙ্গনের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতেই বামে এবং ডানে পড়বে একটি পরিসর পুকুর ও পদ্মবাগান। বাঁদিকে দীর্ঘ স্বচ্ছজলরাশির হ্রদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জাপান ভ্রমণের সময় ১৯১৬ সালের ১৮ জুন তারিখে বাগানবাড়ির প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে নৌকো ভাসমান নীলাভ হ্রদ এবং অজস্র পদ্মফুলের গোলাপি সমারোহ দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন! এই ভালোলাগা বিস্ময়কর রূপ পরিগ্রহ করেছিল এখানে ৭৬ দিন অবস্থানকালে আরও নানা ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, যা তিনি জীবদ্দশায় ভুলতে পারেননি। বন্দরনগরী য়োকোহামার এই সানকেইনএন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর রচিত কালজয়ী জাপান যাত্রী গ্রন্থে সেই বৈচিত্র্যময় অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা কিছুটা লিপিবদ্ধ করেছেন।

সানকেইএন বাগানবাড়ি আজকে জাপানে অন্যতম প্রধান রবীন্দ্রতীর্থ হিসেবে সুপরিচিত রবীন্দ্রভক্তদের জগতে। তীর্থস্থান এই কারণে যে, এই বাড়িতে তাঁর জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা বিদেশের অন্যত্র ঘটেনি। যেমন, সবুজ বৃক্ষঘেরা শোওফুকাকু নামক তিনি যে অতিথিকক্ষে ছিলেন সেখানকার বারান্দা থেকে সমুদ্রতীর দেখা যেত। অবাধ বাতাস, পাখিদের কূজন ছিল সারাদিন। প্রতিদিন সকালবেলা তিনি প্রাতরাশ সেরে সবুজের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করতেন। শিল্পকলা সংগ্রহশালায় যেতেন। সেখানকার একটি কক্ষে জাপানি নবীন চিত্রশিল্পীরা মূল্যবান পুরনো চিত্রকর্মের সংস্কার, নকল এবং নতুন চিত্রাঙ্কন করতেন। তখন জাপানে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রভাব থেকে জাপানি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে রক্ষাকল্পে নতুন এক আন্দোলন বা জাগরণ চলছিল। নিহোনগা নামক নতুন এক চিত্ররীতির জন্ম দিয়েছেন প্রভাবশালী মনীষী শিল্পাচার্য ওকাকুরা তেনশিন। ১৯০২ সালে যিনি কলিকাতায় গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, শিল্পী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে গভীর সখ্য স্থাপন করেন। সূচনা হয় জাপান-বাংলা শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় সম্পর্ক।

সানকেইএন এর প্রতিষ্ঠাতা ধনাঢ্য বণিক হারা তোমিতারোওসহ তৎকালীন এই আন্দোলনে জড়িত সকল সংস্কৃতিজীবী ও শিল্পী ওকাকুরার প্রত্যক্ষ শিষ্য বা ভাবানুসারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জাপানের এই নতুন চিত্ররীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। এখানেই একজন তরুণ চিত্রশিল্পী শিমোমুরা কানজানের সদ্য সমাপ্ত দীর্ঘ চিত্রকর্ম য়োরোবোশি (অন্ধ ভিক্ষু) দেখে রবীন্দ্রনাথ এতই মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে এটা শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু মূল চিত্রকর্ম দেয়া তো সম্ভব নয়। তাই কর্ণধার হারা তোমিতারোওর অধীন আরেকজন চিত্রশিল্পী আরাই কম্পো ছবিটির হুবহু নকলচিত্র অঙ্কন করে এঁকে দেন। শিল্পী কাম্পোর অসাধারণ দক্ষতা দেখে কবিগুরু তাঁকে কলিকাতার ঠাকুর বাড়িতে অবস্থিত বিচিত্রা ভবনে শিল্পকলার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। এই ঘটনা পরবর্তীকালে সুদূরপ্রসারী এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে দুদেশের মধ্যে।

এই বাড়িতে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ জাপানিদের দৈনন্দিন জীবনের লাইফ-স্টাইল তথা নিয়মমাফিক কর্মকুশলতা, রুচিবোধ, আচার-আচরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগ এবং নান্দনিক ধ্যানধারণা রবীন্দ্রনাথকে অসম্ভব আলোড়িত করেছিল। সানকেইএন বাগানবাড়ির গৃহগুলোর প্রত্যেকটির নাম দেখে অভিভূত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে তখন ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন তরুণ চিত্রশিল্পী মুকুলচন্দ্র দে। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, সাসকেইএন বাগানবাড়ির গৃহগুলোর নামকরণ থেকে কবিগুরু প্রভাবিত হয়ে শান্তিনিকেতনের ভবনগুলোর নামকরণ করেছিলেন। প্রতিদিন খ্যাত-অখ্যাত জাপানিরা আসতেন কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য, যা তাঁকে জাপানিদের মনমানসিকতা সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জনে সহায়তা করেছিল।

সানকেইএন বাগানবাড়িতে ছিল ঐতিহ্যবাহী সবুজ চা পানের কুঞ্জগৃহ হাৎসুনেজায়া নামে একটি গৃহ। সেখানে প্রায়শ কবিগুরু বসে সবুজ চায়ের স্বাদ গ্রহণ করতেন। এই চা-পান রীতি যাকে জাপানি ভাষায় শাদোও বা চা-নো-য়ু বলা হয়, শান্তিনিকেতনে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন জাপানে আগমনের আগেই ওকাকুরার শিষ্য কলিকাতা ও শান্তিনিকেতনে অবস্থানরত তরুণ বৌদ্ধভিক্ষু হোরি শিতোকু, বৌদ্ধপণ্ডিত কাওয়াগুচি একাই, চিত্রশিল্পী য়োকোয়ামা তাইকান, কাৎসুতা শোওকিন; জুদোও ক্রীড়াবিদ সানো জিননোসুকে প্রমুখের প্রভাবে। এই প্রথম সফরের সময় জাপানে পৌঁছেই কবিগুরু প্রথম জাপানি আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলেন ঐতিহ্যবাহী শাদোও চা-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রভাবশালী দৈনিক আসাহিশিম্বুন পত্রিকার কর্ণধার মুয়ারায়ামা রিউহেই-এর ওসাকা শহরস্থ বাসভবনে। কিমোনো পরিধানে সুসজ্জিতা মুরায়ামার কন্যা চা পরিবেশন করেছিলেন কবি ও তাঁর দলবলকে। উল্লেখ্য যে, এই চা-রীতি নিয়ে ওকাকুরা তেনশিনের রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত একটি গ্রন্থ দি বুক অফ টি, ১৯০৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত। এই গ্রন্থটি জাহাজে পড়তে পড়তে জাপানে আগমন করেন ওকাকুরাসুহৃদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিগুরু জীবদ্দশায় মোট পাঁচবার জাপান ভ্রমণ করেন। ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২৪ এবং ১৯২৯ সালে দুবার। এর মধ্যে দুবার ১৯২৪ এবং ১৯২৯ সালে তিনি সানকেইএন বাগানবাড়িতে যান পুরনো প্রিয় বন্ধু হারা তোমিতারোওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। হারা মহাশয়ের সঙ্গে কবিগুরুর গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। বন্ধুত্বের সম্মনার্থে তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ স্ট্রে বার্ড হারা তোমিতারোওকে উৎসর্গ করেছেন। এখানেই তিনি কবিতাগুলো লিখেছিলেন। শান্তির অমরাবতী সানকেইএন বাগানবাড়ির উদ্যানে নিরুদ্বিগ্ন নির্ভার চিত্তে

আয়েশপূর্ণ ভঙ্গিতে বসে থাকা তাঁর অপরূপ ছবি বিদ্যমান। ছবি দেখে সহজেই বোঝা যায় আসলেই কবিগুরুর কতখানি ভালো লেগেছিল সানকেইএন। গভীরভাবে ভালোওবেসেছিলেন বিধায় বারংবার সুযোগ খুঁজে স্মৃতিকাতর য়োকোহামা বন্দরনগরে পা রেখেছেন। সানকেইএন বাগানবড়ি বদলে দিয়েছিল কবিগুরুর জীবন ও দর্শন বললে অত্যুক্তি হয় না। কবিগুরু যেমন একে বিস্মৃত হননি, তেমনি সানকেইএন কর্তৃপক্ষও এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী বিরলতম প্রতিভাধর মানুষটিকে বিস্মৃত হয়নি। এই সম্পর্ককে স্মরণীয় করে রাখার জন্য উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নান্দনিক স্মারক ভবনে অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কবিগুরু ১৯১৬ সালে যে অতিথিকক্ষে অবস্থান করেছিলেন সেটা ১৯২৩ সালের মহাভূমিকম্পে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে তাতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম মুদ্রিত আছে। এই বিধ্বস্ত স্থাপত্যের পাশেই একটি বিশ্রামকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যার দেয়ালে কবি রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে। সেইসঙ্গে সংরক্ষিত শতবর্ষ পুরনো হাৎসুনেজায়া নামক চা-গৃহের পাশে একটি স্মৃতিফলকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক আকুতাগাওয়া রিউনোসুকে যে একসময় এখানে চা পান করেছিলেন সেই তথ্য উল্লেখিত আছে। এইভাবে শতবছর পেরিয়ে সানকেইএন বাগানবাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি আজও সযত্নে সংরক্ষিত ও স্মরিত হচ্ছে যা দেখে বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করতেই পারি।

আলোকচিত্র:

১. সানকেইএন বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে

২. সানকেইএন বাগানবাড়ির স্মারক ভবনে রবীন্দ্রনাথের ছবি

৩. সানকেইএন বাগানবাড়ির চা-গৃহ হাৎসুনেজায়া

৪. রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখিত চা-গৃহের স্মৃতিফলক

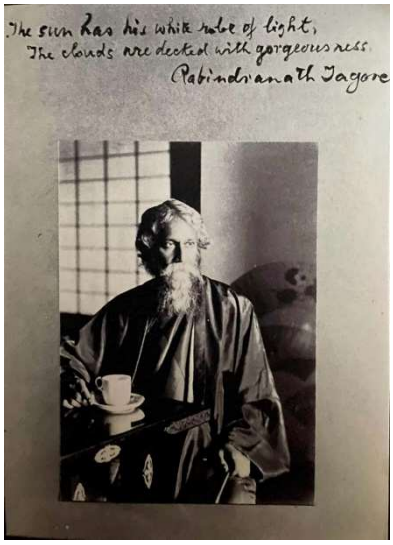

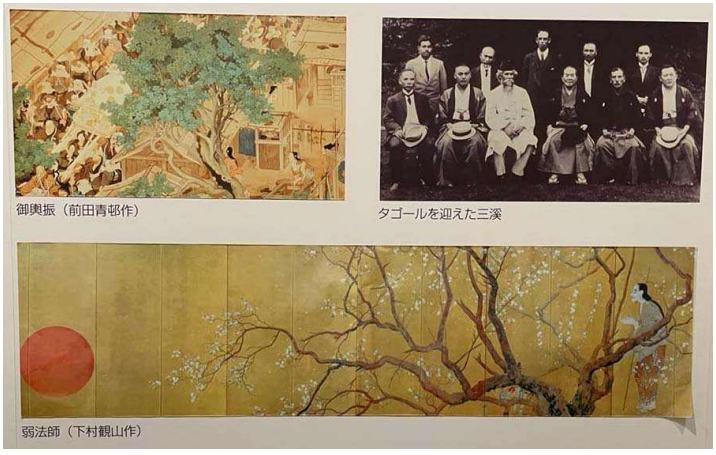

ORYXPEER

Join the Future with Oryxpeer

Your Gateway to Exciting Careers in IT & Technology

Oryxpeer is a dynamic recruitment company based in Tokyo, connecting talented professionals with leading organizations worldwide. We specialize in IT, software engineering, and multilingual technical talent to power global businesses.

Positions Available

Software Engineers
AI / IoT Specialists
Bilingual Technical Interpreters
Full-Stack Developers
Cloud & Infrastructure Engineers
Project Managers

Why Join Oryxpeer?

✓ Exciting global career opportunities
✓ Work with cutting-edge technologies
✓ Bilingual & multicultural environment
✓ Support for career growth and relocation

Apply Now!

info@oryxpeer.com
www.oryxpeer.com
Tokyo, Japan

টমি

স্বর্ণাভ বেরা

আমার একটা পোষা কুকুর আছে। তার নাম টমি। টমির সাথে আমার আলাপ কি আজকের? সেই তখন প্রথম গাজনতলার মাঠে খেলতে যেতাম তখন টমি তখন সাদা ধবধবে ছোট্ট ছানা। পিলপিল করে দৌড়ে বেড়াত মাঠ জুড়ে। আর তারপর খেলা শেষ হয়ে গেলে আমার পিছন পিছন বাড়ি অব্ধি আসত, গেট এর ভিতর ঢুকতে পারত না, মা তাড়িয়ে দিত, "অ্যাই হাট যা, ইশ কোথায় না কোথায় হেগে রাখবে! অনাচ্ছিস্টি যত"। টমি ফিক করে একটা আওয়াজ করে আবার পিলপিল করে চলে যেত, শুধু গলির মোড়'টা ছেড়ে যাবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখত আমি দেখছি কিনা। আমি তো থাকতামই আর টমি রোজ দেখত কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে মা বাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। টমির বোধহয় মায়া হত আমার ওপর, এইটুকু বাচ্ছা তার কোনো ছুটি নেই গো? আমার মা তো কই আমায় পড়তে বসায় না, কান ধরে টানে না, ভাইদের সাথে হুটোপুটি করলে বকে না। মানুষদের কি কষ্ট বাবা! ভাগ্যিস মানুষ হই নি গো! এরপর টমি এক দৌড়ে পাড়ার অন্য ঘেয়ো কুকুরগুলোরকে কাটিয়ে ওর মায়ের কাছে চলে যেত। মা খাবার আনত কিনা, কোত্থেকে আনত কে জানে, কিন্তু দিব্যি খেতে।

ছবি : দেবস্মিতা বিশ্বাস

সেদিন মা ছিল না বাড়িতে, আমি টমিকে ডেকে এনে খেললাম আমাদের বাড়ির সামনের সিমেন্টের উঠোনে, সে কি মজা কি মজা! টমি আমার রবারের বলটা পেয়ে তো প্রায় ভুলেই গেছিল সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এইবার মা খাবার আনবে। কে জানে হঠাত কিছু কুকুর ডেকে উঠল রাস্তার মোড়ে। কেমন অদ্ভুত একটা ডাক। টমি তো কান খাড়া করে শুনল, তারপর চোঁ-চাঁ দৌড়। আমিও ছুটলাম টমির পিছন পিছন। গিয়ে দেখি টমির মা ছটফট করছে রাস্তার ওপর, মুখে বিস্কুটের গুঁড়ো। বাকি ছানা গুলো পাথরের মত শুয়ে আছে রাস্তায়। টমি কিছু দূর থেকে দাঁড়িয়ে তখন চিৎকার করছে। পায়খানা পরিস্কার করার লোক টুকা বসেছিল পাশে, বলল দত্ত দের গিন্নিরা তো চলে গেছে, বাড়ি ভাগ হয়ে গেছে তো, দত্ত-গিন্নির জা তাই বিষ

মিশিয়ে দিয়েছে আজ,যাতে কুকুরগুলো খাবারের খোঁজে না আসে আর। আমি টমিকে দু-হাতে তুলে নিয়ে এক দৌড় দিলাম বাড়ির দিকে, চোখ তখন আমার জলে ঝাপসা হয়ে গেছে। এই দৃশ্য টমিকে আর দেখতে দিই নি। সেই দিন থেকে টমি আমার সাথেই থাকে। মা প্রথমে রেগে গেলেও পরে আর রাগ করেনি, উলটে টমির শরীর খারাপ হলে মায়ের চিন্তা হত বেশী। আমি তো জানতাম কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে, যেমন লোভ করে আমার চকলেট টা খেয়ে নেওয়া। ভাই'ও ভালোবাসত খুব টমিকে। ছাদে ক্রিকেট খেলছি, বল পড়ে গেছে নীচে। "টমি লু" বললেই টমি এক দৌড়ে নীচে নেমে বল নিয়ে হাজির, কোনো ক্লান্তি নেই তার। শুধু সন্ধ্যেবেলা চাউমিন দিতে হবে, নইলে এখন সোফার তলায় গিয়ে সেঁধোবেন তিনি। আর রাত্তিরে কার্নিশে বিড়াল দেখতে পেলে হল একবার, এমন চ্যাঁচাবে যে সারা বাড়ির ঘুম কাবার।

আমার তখন ক্লাস নাইন। পাড়ার একটি মেয়ের ওপর ঘামাসান ক্রাশ, সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেই চোখে অন্ধকার, পায়ের তলায় খাদ। আমি তো বাওয়া কথাই বলতে পারছি না, ওদিকে টমি বাবা দিব্যি গার্লফ্রেন্ড জুটিয়ে বসেচেন, ওপাড়ার কুকুর লালি, গায়ের রঙ লালচে হলুদ, বেশ মিষ্টি । আমার ওপর আবার ফিক ফিক করে হাসা হত, ওকে যখন পৌলমির কথা বলতাম, কিংবা ওকে নিয়ে লেখা কবিতা পড়তাম। বেশ মজা নিত খোকা, ভাবত 'উফফ মানুষ জাতটা কি আজব ভাই, ফিক ফিক, শালা পছন্দ তো যা, কথা বল, তা না দেখো

আমায় মহাভারত শোনাচ্ছেন। দাঁড়া তোর স্কুলের কেডস চিবিয়ে রাখব শুক্কুরবারে, তখন কানমলা খাবি ঠিক সিধা হয়ে যাবি।'

মাধ্যমিকের এক হফতা আগে, ঠাকুমা বলল পাশের বাড়ির সরকার দের মেয়েটা পালিয়ে গেছে একটা বিহারী ছেলের সাথে। আমার তখন ঠাকুমা কে যমদূতের মত মনে হচ্ছিল। বাড়ির সমস্ত দেওয়াল, মেঝে, জানলা দরজা কেমন কালচে হয়ে গেলো। জানিনা কিভাবে আবার পড়ার ঘরে এসে বসেছি, জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সরকার দের ফাঁকা ছাদ। পৌলমির স্কুলের ড্রেসটা তখনো শুকোচ্ছে দড়িতে। টমি? টমি কই? টমিটা যদি থাকত! হঠাত খুব হিংসে হল টমির ওপর, হুঁহ প্রেম করছে কোথাও গিয়ে দেখো। শালা!
তখন রাত এগারোটা, মা সবে কান্না জুড়তে বসবে বসবে করছে, টমি নিঃশব্দে গেট দিয়ে ঢুকল। মা কত বকল ওকে, একটুও আওয়াজ করল না। সোজা আমার কোলে উঠে বসে রইল। তখন প্রায় রাত দুটো, টমির আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। চীৎকার নয়, একটা গোঙ্গানি, এত আস্তে যে মায়েরা শুনতে পায় নি। আমি বোকার মত জিজ্ঞেস করে চলেছি কি হয়েছে রে টমি? টমি আমায় জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেই চলেছে। আমিও তখন কিশরবেলার সমস্ত কষ্ট দিয়ে কেঁদে চলেছি, চাপা গলায়, যাতে কেউ শুনতে না পায়। টমিকে পৌলমির কথা বলতে বলতে তোতলা হয়ে গেছি কাঁদতে কাঁদতে। টমি যদি কথা বলতে পারত তাহলে হয়ত বলত কিভাবে ওর চোখের সামনে ট্যাক্সি'টা লালিকে পিষে দিয়ে গেল। টমি অপেক্ষা করেছিল, যদি লালি ফের ওঠে, ফের কান নাড়ে। যতক্ষণ না পাড়ার ছেলেরা লালিকে তুলে নিয়ে যায়, ততক্ষণ বসে ছিল ঠায়ে। আমায় কাঁদতে দেখে হয়ত মনে মনে বলছিল টমি, মানুষ জাতটা কি অদ্ভূত না? কত অল্পেই কাঁদে। ধূর ব্যাটা, দেখ আমার পিঠটাই ভিজিয়ে দিল কেঁদেকেটে। ঘুমো গে যা।
পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি টমি নেই ঘরে। মা'কে জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় হঠাত মনে হল থাক। পাগল ভাববে আমায়। একেই অঙ্কে সত্তর পেয়েছি এবার। টমির কথা যদি আবার বলি কি বলবে কে জানে। আসলে টমি নেই, কোনোদিনও ছিল না আমাদের বাড়িতে। টমি'কে সেদিন খেলতে আনি নি বিকেলে। ডাক-টেলস দেখতে দেরী হয়ে যাবে বলে মাঠ থেকে ওকে আড়াল করে চলে এসেছিলাম। পরদিন বল কুড়োতে পুকুরের ধারে নামতে গিয়ে দেখি টমি আর তার ভাইদের কাঠ হয়ে যাওয়া ছোট্ট শরীরগুলো ঝোপের ধারে ফেলে গেছে কে, মুখে বিস্কুটের গুঁড়ো।
সাতদিন কেঁদেছিলাম তার পরে। আর কখনো কুকুর পুশিনি। মা একটা সোজা উপায় বলে দিয়েছিল, সব কুকুরের মধ্যে ওকে দেখবি, ওকে বর হতে দেখবি, প্রেম করতে দেখবি, বাবা হতে দেখবি, বুড়ো হতে দেখবি। তাই আমি আর টমি আজ একই বয়েসি। ওর ও আঠাশ বছর বয়স। পিনাকিদার বাড়িতে মাঝে মাঝে গেলে দেখি ওকে, মুচিপাড়ার মোড়ের চা-দোকানে দেখি ওকে, দার্জিলিং'এর কুয়াশা ঢাকা ম্যালে দেখি ওকে। আমার সাথেই ও বুড়ো হবে। তখন এক কাপ চা নিয়ে শীতের রোদে আরাম কেদারায় বসব, আর ওকে আমার মানুষের ভাষায় গল্প শোনাব। টমি তখন রোদে শুয়ে শুয়ে ভাববে, "মানুষ জাতটা কি আজব ভাই, সারা জীবন শুধু বকেই যায়, একটু যে নিশ্চিন্তে রোদ-পোহাবো তার জো আছে? ফিক।"

When Ma Durga Visited Tokyo

Kundan das, University of Delhi

The autumn wind had already turned Tokyo golden. Leaves rustled like whispers, and the cool air brought with it a strange emptiness to little Ananya's heart. Back in Kolkata, this time meant dhaaker taal, shankha's call, and laughter floating from para pandals. But here in Tokyo, all was silent. The trains ran on time. The vending machines hummed. And the sky was grey.

Ananya sat by the window, her nose pressed to the glass, eyes fixed on the maple tree outside that looked nothing like the shiuli flowers she missed.

"Maa, why doesn't Durga Puja come here?" she asked her mother one night. Her mother smiled weakly, tucking her in. "Ma Durga is everywhere, sweetie. You just have to feel her."

But Ananya wanted more than feeling. She wanted to see.

That night, she dreamt something magical. A gentle golden light filled her room. She opened her eyes and gasped — standing by the window was a tall, graceful woman. She had ten arms, each holding something wondrous — a lotus, a sword, a bell, and... a folding fan? She wore a silk kimono patterned with lotus motifs, and her hair was pinned with a kanzashi comb. By her side, instead of a lion, stood a regal-looking creature — a white tiger with glowing eyes, wearing a samurai helmet.

"Are you... Ma Durga?" Ananya whispered.

The woman smiled. "Yes, child. Did you think I only stay in Bengal?"

Ananya's heart raced. "But you look... Japanese!"

Photography: Moumita Mukherjee

"I appear as my children imagine me," Ma said, her voice like a lullaby. "Here in Tokyo, I wear what brings comfort to your heart."

She stretched out her hand. "Come, I want to show you something."

In a blink, Ananya found herself flying over the Tokyo skyline — over Shibuya crossing lit up like Diwali, over Asakusa where temple bells echoed, over Odaiba where the sea sparkled under moonlight.

Then they landed in a quiet street. There, in a small community hall, stood a makeshift Durga idol. Some people were singing, some drawing alpona on the floor. A boy played dhaak on a bucket. A Japanese lady was trying on a red-bordered saree.

Ananya's eyes sparkled. "This… this is Puja!"

Ma Durga nodded. "Puja is not in the place. It is in the people. In devotion. In love. In memory."

Tears welled in Ananya's eyes. "Will you stay for Bijoya Dashami?"

Ma laughed. "I'm always here, even when you don't see me."

And just like that, she faded into the soft mist of Tokyo dawn.

The next morning, Ananya woke up smiling. She pulled her parents into the kitchen.

"Let's celebrate Puja here! We can make an idol out of clay! I'll draw alpona! We can video call Dida and chant together!"

Her father blinked, surprised. "What made you change your mind?"

Ananya just looked out the window, where the maple tree now seemed to bloom with invisible shiuli.

"Because Ma Durga came to Tokyo last night."

বনের ফুলের মালী

সৌভিক সরদার

ইস্পাতের নগরের জমা জলে, ফুটে ওঠা পদ্ম
দেখেছে শুধুই, সুন্দরের আতিশয্য।

সে দেখেছে,
বাগানের শহুরে মালীর যত্নে,
বেড়ে ওঠা, গোলাপ, জবা,
টগর, রজনীগন্ধা আর হাসনুহানা।
তাদের সৌন্দর্যে ফুলের বাগানের ঘটে শ্রীবৃদ্ধি।
ভগবান আর প্রেমিকারা তাদের কে পেয়েই পায় তৃপ্তি।

কিন্তু নাম গোত্রহীন বনের ফুল?

যারা আঁধারে অবহেলায় ফুটে ওঠে,
বিনা সমারোহে?
তাদের কি গোপনে এসে,
গোপনেই চলে যেতে হয় এ জগত থেকে?

সূর্যমুখী বললে
"তা কেনো হবে,
এদের ভাষা যারা বোঝে
ভাব এদের তাদের সাথে,
সে তুমি বোঝোনা
তাতে এদের কিছু যায় আসেনা"

শহরের ভগবান, এদের অচ্ছুত করেছে,
কিন্তু এই ক্ষুদ্র বনের ফুলের মালা গেঁথে,
কোনো এক বনের মালি, করেছে বিধাতাকে সমর্পণ,
বনের ফুলের পাপড়ি হয়ে উঠেছে বনদেবীর আভরণ।
এ প্রাপ্তি, গোলাপ টগর এর থেকে কোনো অংশে নয় কম।

দেশের মাটিতে,
লালপদ্ম খুঁজে পেলো সে এক বনমালী কে।

যে ফুল ফুটে যায় অগোচরে,
তাদের মধ্যে হয়তো নেই গোলাপের ঔদ্ধত্য।
বা রজনীগন্ধার আভিজাত্য।
কিন্তু এই দাবিহীন ফুলের মধ্যে রয়েছে মাটির গন্ধ
তাদের সাথে বনের মৌমাছি, বনের পাখি
করে খেলা দিবারাত্রি।

বনমালী ব্যস্ততার মাঝে
হেসে বললে,
"এদের নেই নাম আর পদবীর খ্যাতি বা আশা।
তাই না আছে কিছু হারানোর দুশ্চিন্তা।
হেসে খেলে তারা বেশ আছে,
জলা জঙ্গল ভরা নির্মল এই বাংলা দেশে।"

মৃন্ময়ীকথা

অর্চিস্মিতা মিশ্র

১.
ভেজা ঘুঙুরের মতো পিছুটান
ছুঁয়ে থাকে আনখশির
খাঁচাটি উঠোন হয়, ধুলো জমে
অতীত উড়ে আসে, অতীত ছোলা খায়
উনুনেতে জল ঢেলে শুয়ে গেলি অবেলায়
সখি, ক্ষমা করা এতই সহজ?
২.
চীনেমাটির পেয়ালার মতো
ভঙ্গুর এই জন্মভিটে, তবু
তুই এসে দাঁড়ালেই
জোনাকি জন্ম নেয়
কৃষ্ণচূড়াটির ধূসর কঙ্কালে
চুমু দেয় পঞ্চমীর চাঁদ
পায়ে কিছু ঠেকে গেলে অসাবধান
আঁচলে শ্যাওলা মুছে দেখ :
সেই শাঁখ, যা তোর জন্মে বাজেনি!
৩.
স্বপ্নেরা তোমার দাওয়ায়
মুগ্ধচোখ পিঁড়ি পেতে
শাকান্ন চাইছে প্রতিদিন
অথচ যাজ্ঞসেনী
অনায়াসে ভুলে আছো কবচকুণ্ডল
প্রণয় ভিন্ন বাণ আর যত আছিল তূণীরে।
৪.
অধোমুখ কেন? সবাক সম্মতি দাও।
তোমার অনুজ্ঞা ছাড়া যুদ্ধে যাবে না
কারো প্রিয় ও সন্তান
হলুদের হাতে চোখ মুছে এসে
পাঞ্চজন্যে রাখো
সনিষ্ঠ চুম্বন ।

Acrylic on paper
রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

বাংলার প্রাচীন সামাজিক, সাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতি তে পেঁচার গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৮৬২ তে কালি প্রসন্ন সিংহের "হুতুম পেঁচার নকশা " বইটি বাংলা সাহিত্যে আজও বিশিষ্ট মর্যাদার জায়গা তে আছে।

পূর্ব বর্ধমানে নতুন গ্রামে আঞ্চলিক কাঠের তৈরি বিভিন্ন ছোটো বড় আকৃতির রঙিন জোড়া পেঁচা শতাব্দী প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালী বাড়ির মঙ্গল মূর্তি রূপে গৃহে স্থান পেয়ে আসছে।
সম্পদ ও মঙ্গলের দেবী লক্ষী ঠাকুরের বাহন রূপে পেঁচা পূজিত হয়। বাংলাদেশের কয়েক দশকের মঙ্গল শোভা যাত্রা তে পেঁচার মূর্তি প্রধান প্রদর্শনের শিল্প বস্তু যা খুব জনপ্রিয়।
পেঁচা মূলত নিশাচর প্রাণী দিনে এরা ভালো করে দেখতে পায়না। শহর অঞ্চলে পুরোনো বাড়ির বড় বড় ঘুলঘুলি তে এদের পছন্দের বাসস্থান ছিল। কিন্তু নগরয়নের চাপে সেই বাড়ি গুলি হারিয়ে যাওয়ায় এদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। শহরে বা মফস্বলে আজ আর পেঁচা খুব কমই চোখে পড়ে। প্রাণী পেঁচা ও দারুশিল্পের রঙিন পেঁচা দুটোই আজ বিপন্ন। তাই দীর্ঘ দিন ধরে তাই পেঁচার নানান ছবি এঁকে যাচ্ছি মানুষ কে সচেতন করতে। আমার সীমিত সামর্থে এ এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

In Bengal's ancient social, literary, and religious culture, the owl has held a significant role.
Kaliprasanna Singha's 1862 book "Hutom Pyanchar Naksha" (Sketches by Hutom the Owl) still holds a place of high regard in Bengali literature.
In Nutan Gram of Purba Bardhaman, colorful wooden owl pairs of various sizes have, for centuries, been kept in Bengali homes as auspicious symbols.
The owl is also worshipped as the mount of Goddess Lakshmi, the deity of wealth and prosperity.
For decades, the owl has been a prominent and popular artistic figure in Bangladesh's Mangal Shobhajatra (auspicious procession).
Being a nocturnal creature, the owl cannot see well during the day. In urban areas, they once favored the large ventilated attics of old houses. But with the pressure of urbanization and the loss of such buildings, their existence is now endangered.
Today, owls are rarely seen in cities or towns. Both the living owl and the traditional colorful wooden owl crafts are now threatened.
That is why I have been painting various depictions of owls for a long time — to raise awareness.
This is my humble attempt, within my limited means, to contribute toward preserving their existence.

ボンゴバザール
BongoBazar
FRESH & HALAL MART
Delicatessen
ボンゴバザール
BongoBazar
FRESH & HALAL MARKET
BONGO BAZAR】
HALAL & SUPER MART
3-208-1 Hikonari Misato-city, Saitama.
Open Every day:10:00～20:00

The Last Stand: A Tale from Kargil

Sudipto Saha

The Breaking Point

"*Sir, reinforcements are delayed. Artillery support is available, but we need to hold our position*" said Sepoy Ramesh, his voice hoarse, eyes bloodshot from hours of continuous fighting. Captain Arjun Rathod looked out across the bloodied slope of Point 4500, the strategic peak that now stood witness to the courage and carnage of his men. The enemy had launched another wave of counterattack, pushing his dwindling forces to the brink.

"*How many left?"* Arjun asked quietly.

"*Just five of us, Sir"* came the grim reply.

Arjun's jaw clenched. The wind howled through the ridges, as if mourning the dead. The snow beneath his boots was stained red, and the acrid stench of gunpowder and smoke clung to every breath.

The Warrior's Legacy

Born in the sun-drenched deserts of Rajasthan, Captain Arjun Singh Rathod came from a lineage etched in courage and sacrifice. The Rathods, one of the most valiant clans of the Rajputana, trace their roots to the Suryavanshi lineage. For centuries, they had defended the forts of Marwar and Mewar, laying down their lives for Maharajas and Ranas, and later, for independent India. His grandfather, Major Veer Singh Rathod, had embraced martyrdom during the 1971 Indo-Pak war at Longewala, holding the post till his last breath. Years later, his father, Colonel Pratap Singh Rathod, laid down his life during an intense combat operation in the icy wilderness of Siachen in 1985. Arjun was just fifteen when the black ambassador car rolled into their courtyard. As the army officers stepped out, somber and silent, his mother, Sunita, broke down, clutching young Arjun tightly in her arms.

From his earliest years, Arjun had been fascinated by the stories of Rajput bravery. His father often spoke of Veer Durgadas Rathod—the legendary warrior who defied the might of the Mughals to preserve the honor of Marwar. "*Beta ji, Rajput kabhi apni peeth nahi dikhate. Hum maut se aankh mila ke baat karte hain*" (Son, Rajputs never show their back, they stare straight in the eyes of death) he would say. These words shaped Arjun's very being.

When he announced his decision to join the Indian Army, Sunita's heart broke afresh. "*Why, beta? Haven't we given enough?*"

Arjun held her hands firmly. "*Maa, our blood has always defended this land. If not me, who else will carry his legacy?*"

Her eyes welled with tears, but she saw in her son the same fire that had once burned in her husband's eyes.

Placing a tilak on his forehead, she whispered, "*Then go, bacchha, fight with honor. Let Maa Bhawani be with you, and come back a legend*".

Rising Through the Ranks

Commissioned into the 2nd Battalion, Rajputana Rifles, Arjun excelled. Known for his composure under pressure and indomitable spirit, he was quickly entrusted with critical missions. During "Operations Rhino" in 1991, he rescued 11 ambushed soldiers, in Assam earning a Sena Medal for gallantry. Colonel Gogoi, one of the high ranked official in the mission, said: "*He is not just a fighter—he's the flame that burns brightest in the darkest hour.*"

Now, that hour had returned. It was Kargil, 1999—and the war had turned desperate. Under the cover of winter snow, Pakistani troops and militants, disguised as insurgents, had infiltrated deep into Indian territory along the high-altitude stretches of the Himalayas. They occupied key mountain posts in Kargil and adjacent areas near Pakistan-occupied Kashmir (PoK), taking advantage of the seasonal troop withdrawals by India. As per long-standing practice under the Simla Agreement, many forward posts were vacated during the harshest months to protect soldiers from the sub-zero extremes. The enemy had fortified themselves in well-concealed bunkers dug into the rocky terrain, often positioned on reverse slopes and naturally protected escarpments. These locations offered superior tactical advantage—steep inclines, obstructed sightlines, and rugged contours made it nearly impossible to detect or directly target them.
India's aerial fleet, including helicopters and attack choppers, was largely ineffective at such altitudes. The thin air compromised lift capabilities, while the exposed airspace left aircraft vulnerable to enemy fire. Moreover, the proximity to the Line of Control (LoC) posed the constant danger of accidental violation, potentially triggering wider geopolitical consequences. Given these limitations, sending in infantry was the only viable option. The task was daunting: a vertical war fought on icy slopes against entrenched enemies.
Among those entrusted with these near-impossible missions was Captain Arjun Singh Rathod. He was assigned to lead his men in the mission to recapture Point 4500—a towering peak overlooking the Srinagar-Leh highway, India's arterial lifeline to Ladakh. Holding this point was not just a tactical necessity—it was a matter of national survival.
For Arjun, this was not merely a battle. It was a calling.

The Mountain of Death

July 4, 1999 - The ridge loomed above like a predator, jagged and cold. Arjun and his team of 30 began their ascent. Each step upward was a gamble. The enemy, entrenched and armed with heavy machine guns, awaited at the top like an Eagle. They could not advance during daylight, as the enemy, positioned at a higher altitude, had a clear vantage point over the surrounding terrain. Any movement would have immediately drawn their attention. Therefore, they chose to proceed under the cover of night.

"*We go silent, no lights, no sounds. Use the ridge shadows,"* Arjun briefed "*They have the height. We have the will*". They moved like shadows, gripping ropes, slipping on ice, whispering prayers. Midway, they heard a shout from above "*Ambush! Spread and fire!*" and then gunfire exploded. A sepoy tumbled, screaming, lost to the darkness below. Bullets rained like steel hail, Grenades burst, lighting the snow crimson. Arjun charged forward, yelling orders, pulling back the wounded, covering their retreat. His rifle never stopped barking.

Holding the Line

By late night, they had secured half the ridge. But the partial success came at a cost—twelve men were dead. Arjun stood amid the carnage, blood freezing on his uniform. The enemy launched a savage counter attack. Mortars screamed from the sky, and the peak turned into a fiery inferno. Arjun's men fought tooth and nail, bayonets clashing, grenades detonating feet away.
"*Sir, we're down to eight!*" someone yelled.
He turned briefly to the men beside him and said "*In the battle of Kurukshetra, Abhimanyu was alone and unarmed, yet he did not flee the battlefield. He single-handedly took on seven great warriors. Each of you be 'Abhimanyu', each of you are equal to ten men*". He further added what his father had once told him, "*Rajput kabhi apni peeth nahi dikhate. Hum maut se aankh mila ke baat karte hain*", the ancestral words echoed through the freezing air. He turned to Lieutenant Akshat Sharma, his second in command and closest friend, "*We hold till death, Lieutenant*".

Akshat grinned, blood dripping from his forehead, "*We're Rajputs, Sir! Death is a tradition!*"
They pushed back wave after wave. In the smoke and blood, time lost meaning.

The Trap

Then came the silence. The kind that made the hairs rise. Suddenly, shadows moved around them. The enemy was encircling. Sepoy Binayak was the next to fall, stabbed in close combat. Ramesh, the radio operator, took a sniper's bullet. Only Arjun remained. The battlefield was a graveyard. Snow turned into mud, bodies frozen in final expressions of defiance. Arjun's vision blurred from smoke and blood. His shoulder was wounded. He picked up Akshat's rifle who had gone down a few moments ago fighting like a wounded tiger and ducked behind a rock. In the eerie quiet, he whispered, "*Forgive me, my brothers. I'll not let your deaths be in vain*"

The Final Choice

Arjun grabbed the radio.
"*Base command, this is Captain Arjun Rathod. Do you copy?*"
A voice cracked through: "*Captain! Yes—we hear you! Reinforcements are near. Hold on!*"
"*Negative… I am surrounded… No men left... No ammo... Enemy preparing to advance*"
"*Stay hidden—we're sending reinforcements from the base camp which would reach in a couple of hours*"
"*There's no time…*" gasped Arjun, "*We are so near to recapture the post. If you delay, we will lose it. All my men's sacrifice would be in vain*".
"*We are trying our best Captain to reach you as soon as possible… Hold on… I repeat*"
Arjun closed his eyes for a heartbeat, then steadied his breath, he cannot let go the sacrifices of his comrades. All his men have been martyred and still the shadow of the enemy is looming large. He apprehended that the advantage gained so far would be lost if he waits for the reinforcement to come. As his eyes opened his face gleamed and the jaws tight depicting steel like determination. "*Yes! This is the only way*" he whispered to himself and repeated the words "*Yes! there is no other option left*".
"*Come in Captain… we are not able to hear you… announced the radio*"
"*I am enabling my location beacon,*" he said slowly, deliberately. "*You'll receive my exact coordinates in a moment. Once you have them—fire at the location. I will be charging into the Bunkers now, let the Bofors Guns rain everything you've got down there. Annihilate them…*"
His voice as firm as steel, unwavering, not a trace of fear, only resolve.
A stunned silence followed, then "*Captain, that's suicide! We cannot do that…you too will be gone with that…*"
"*That's duty my friend! If they take this ridge, they'll rain death on our convoys. Stop them now…*"
Another pause, the voice returned, trembling. "*Captain... are you absolutely sure?*"
"*I've never been surer in my life…. India first…. Always…. Fire now*"
The voice paused, choked with emotion. Then came the reply, steady yet heavy with reverence: "*You are the bravest man I've ever known, Captain. Your courage will be written in fire upon the face of these mountains. India will never forget this night—or you. Godspeed, Captain! Jai Hind!*".
Arjun activated the beacon. The target was locked. He whispered to himself a sloka from Geeta "*You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of your actions*"
(कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन).

The Warrior's End

Arjun rose slowly, every muscle in his body screaming with pain. Blood trickled down his arm, his uniform tattered and soaked, but his spirit was resolute. Fear did not exist in him now—only purpose. He

looked skyward, where the stars shimmered in the icy night—a silent audience to his transformation from a boy in the sands of Jodhpur to a lone warrior on a frozen battlefield.

Images flooded his mind. His father in olive greens, his grandfather's stories of Longewala, his mother's trembling hands on his commissioning day. A sudden vision of her face pierced his heart. He closed his eyes briefly and murmured, "*Forgive me, Maa. I will not return alive, but I will return with honour. If I fall today, let it be for the dignity of Bharat Mata. I cannot allow these defilers to stain her*". Drawing in a final breath, he whispered a warrior's prayer, and then roared with the might of generations before him: "*Har Har Mahadev! Jai Hind! Bharat Mata ki Jai!*" and charged upwards towards the bunker held by the enemy. Artillery shells descended from the Indian side. The mountain roared - Fire, metal, snow—everything vanished into an inferno of patriotism soon and then absolute silence prevailed.

"Then go Baccha, fight with honour and comeback a Legend"

The shelling had done the job for India. The post occupied by the infiltrators had been obliterated annihilating all the infiltrator with it. With the first light of the Sun kissing the earth the next morning, Indian soldiers recaptured the peak. They found scorched earth, broken weapons, bodies of the martyrs and the silent tribute of a **Braveheart**.

A beacon still blinked faintly. A diary page was found in Arjun's coat: "*Tell Maa I died free, tell my regiment I never stepped back, tell Bharatmata I did not blink…*"

A few days later Sunita Rathod received the flag and the citation with trembling hands "*He died with fire in his heart. That's how heroes go*".

Captain Arjun Rathod was posthumously awarded the Param Vir Chakra. Point 4500 was nicknamed "*Balidaan Top*" in remembrance of the sacrifice made by Captain Arjun Singh Rathod and his men.

On the cold Kargil nights, the wind still carries a cry—of courage, of sacrifice, of a warrior who chose death so that others might live. The air of Kargil whispers his story of gallantry and sacrifice "***Then go Baccha, fight with honour and comeback a legend***".

Painting : Dr. Sudipto Banerjee

ASAI HOME

株式会社アサイホーム

We are a real estate company.

We are a company that specializes in mortgage loans.

- Applying for permanent residency.
- Don't have permanent residency.
- Rejected for a mortgage loan at another company.

Please contact us first.

Asai Home Co., Ltd.
Head office
〒133-0057 ☎03-6458-0914
3-12-17 Nishikoiwa, Edogawa-ku, Tokyo

Funabori Branch
〒132-0033 ☎03-5879-5138
4-44-9-6F Higashi Komatsugawa, Edogawa-ku, Tokyo

LINE

Person in charge

Naoyasu Matsutani（松谷 尚妥）
TEL：080-1931-1831
Mail：matsutani@asaihome.co.jp

WhatsApp

It is a pleasure to meet you all.
My name is Matsutani from Asai Home Co., Ltd.

I am here to help you with owning property in Japan.
We have assisted many Indian clients with their property purchases.

Clients without permanent residency, or those currently applying for it, are also welcome to consult with us.

You are welcome to contact me through LINE or WhatsApp.

Testimonials from My Clients

The whole process of buying a house was quite smooth and everything was very clearly explained by him. He ensured that we understood all information clearly. He is a very hardworking person, knows what he is doing and can customize searches way better than any digital platform can do.
-Sovan Sen and Antara Sengupta

Smart, sharp, and totally on it. He didn't just help us find a house—he made sure it was the right one. Way better than scrolling endlessly online.
-Bhaskar Dasgupta and Tanaya Mukherjee

Naoyasu was incredibly helpful during my apartment purchase. He arranged renovations and AC cleaning and assisted with setting up WiFi, electricity, and water.
-Somsubhra Ghosh and Sudeshna Ghosh

অনুভূতি

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য

কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে। এখনও চলছে, অঝোরধারে। ৯টা১০।ঘড়ি দেখলেন শ্রীপর্ণা দিদিমণি। দিদিমণি এখন আর নেই,অবসর নিয়েছেন ১০ বছর হয়ে গেল।তবু ডাকটা গেছে থেকে। পাড়ার দোকানদার, কাগজওয়ালা, দুধওয়ালা সবার কাছে এ বাড়িটা দিদিমণির বাড়ি। ৩৫ বছরের চাকরি জীবন এভাবেই থেকে গেছে তাঁর অবসরের জীবনেও।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন দিদিমণি।ইস্ রাস্তা ভর্তি জল। তারওপর আবার রাস্তা খোঁড়ার কাজ চলছে। গ্যাসের পাইপ বসবে।বাড়ি বাড়ি আর সিলিন্ডার আসবে না এখন থেকে। পাইপ লাইনে গ্যাস আসবে ঘরে ঘরে।এভাবেই একদিন ঘরে ঘরে নতুন সিলিন্ডার এসেছিল।মনে পড়ল দিদিমণির। তখন সব বাড়িতে ছিল উনুন।নতুন সিলিন্ডার নিতে ভয় হয়েছিল সবার।যদি বাস্ট করে! হঠাৎ সেই অনুভূতিটা মালুম হল শ্রীপর্ণা দিদিমণির। এখনও হচ্ছে। যদি পাইপলাইন লিক করে! সময় পাল্টায়, সমাজ পাল্টায়,কিন্তু ভয়ের অনুভূতিটা একই রকম। নিরাপত্তার ভয়।

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে চা এ চুমুক দিলেন দিদিমণি। আজ সকালে তিনি ছাদে যেতে পারেননি। দেখা হয়নি সাধের ছাদবাগানটাকে।তাই এই দুঃখভরা অপেক্ষা।

"কি ভাবছ?" হঠাৎ প্রশ্নে চমকে তাকান তিনি। তার চেয়ারে পরিপাটি করে বসে পড়েছে ক্লাস ফাইভের নাতনিটি।"কি রে? তুই এখানে?" অবাক হওয়ার কারণটা

ছবি : কেয়া ভট্টাচার্য্য

তার উপস্থিতি নয়, তার পোশাক। ঘরের জামা পরে দিব্যি হেলেদুলে বসেছে সে। অথচ, এ সময়ে তার স্কুল ইউনিফর্ম পরে আসার কথা। আসলে ঐ একটি পোশাকে তাকে দেখে তৃপ্তি পান দিদিমণি। না না, দিদিমণি বলে নয়, ঐ একটি পোশাকেই নিজের ছোটবেলাটা দেখতে পান তিনি। বাকি আর সবকিছু , পোশাক, খাবার, কথাবলা সব আলাদা মনে হয় তার ফেলে আসা জীবন থেকে।

"আজ স্কুলে যাবি না পুটুন?"

"আজ ছুটি। খুব জল জমেছে স্কুলের সামনে।তাই ছুটি দিয়েছে।"

"কে এসেছিল?"

"কে আবার আসবে?"

"তো তুই জানলি কি করে?"

" ও তো স্কুলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। ও ঠান্মি, একটা গল্প বল না"

"আর আমার স্টক নেই ভাই, সব শেষ।"

"তোমার গল্প বল"

"আমার আবার গল্প কি রে! জানিস পুটুন, আমাদের ছোটবেলায় এরকম বৃষ্টি হলে স্কুলে গিয়ে ফিরে আসতাম। রেইনি ডে।"

"ওমা! যেতেই তো ভিজলে, আবার ফিরতে আরো ভিজলে"

"তা কি করব বল? তখনতো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিলনা—- একবার কি হয়েছিল জানিস—"
পুটুন চেয়ারে পা তুলে বসল। সে নিশ্চিত গল্পের পূর্বাভাস পেয়ে গেছে।
" তখন আমি ঠিক তোর মতো ক্লাস ফাইভে পড়ি।এসময় একবার স্কুল থেকে সবাইকে "বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে" নিয়ে যাওয়া হবে বলা হল। মাথাপিছু ২টাকা ধার্য হল। ছোটবেলায় বছরে একবার বাড়ির সবাই মিলে, শীতকালে পরীক্ষা হয়ে গেলে চিড়িয়াখানায় যাওয়া হত। এছাড়া যদি কোন মেলায় সার্কাস বা ম্যাজিক শো আসতো সেটা দেখতে যাওয়া হত ,এভাবে স্কুলের বন্ধুদের সাথে একসঙ্গে কোনদিন কোথাও যাইনি ।তাই মনটা আনন্দে একেবারে নেচে উঠলো। বাড়িতে প্রথমে একটু আপত্তি ছিল কিন্তু যখন জানা গেল যে শিক্ষিকারাও মানে ম্যামরাও সঙ্গে থাকবেন তখন আর আপত্তি রইল না। মনে মনে কত কল্পনা করতে লাগলাম! ঘরের মধ্যে বসে আকাশের চাঁদ তারা বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডল ,চন্দ্রগ্রহণ ,সূর্যগ্রহণ মায় সমগ্র আকাশের কার্যকলাপ দেখতে পাবো।মানে মাটিতে বসে আকাশে ভেসে বেড়াবো। সে এক ঐশ্বরিক পাওনা।মনে মনে তখন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি রে।"
খুশিতে দুলতে থাকে পুটুন। যেন সেও কাল প্ল্যানেটোরিয়ামে যাবে।
সময় নির্ধারিত হলো বেলা ১০টা। সবাই স্কুলের পোশাক পরে ১০টার মধ্যে স্কুলে পৌচ্ছে যাবে। ঠিক তুই যেমন সাদা ইউনিফর্মটা পরে স্কুলে যাস, একদম ঐরকম। ১০টায় বাস ছাড়বে ।
"তুমিও স্কুল ড্রেস পরতে!" চিরকাল শাড়িতে দেখা তার এত কাছের ঠাম্মিকে সে এভাবে কল্পনাই করতে পারছে না। "তারপর?"
"নির্ধারিত দিনে তো নির্দেশমত প্রস্তুত হয়ে স্কুলে গেলাম।কিন্তু গিয়ে দেখি ,কোথায় বাস? তার বদলে কয়েকজন অভিভাবিকা মানে গার্ডিয়ানস্ আর কয়েকজন ছাত্রী নিজেদের মধ্য কথা বলছে। আমাকে দেখে তারা বলল,"তুই এখন এলি ?" "মানে?"আমি জিজ্ঞাসা করলাম ,"বাসএখনো আসেনি?" তারা বলল ,"তুই জানিস না? কাল দিদিমণিরা গিয়ে ১২টার শোএর টিকিট পাননি।তাই ১০টার শোএর টিকিট নিয়ে এসেছেন।"

টিকিট কাটতে যেতে হত তখন এটা পুটুন জানে।ট্রেন, বাস্, সিনেমাহল, ফাংশন সব কিছুর টিকিট তখন সেখানে গিয়ে কাটতে হত। এটা সে শুনেছে অনেকবার। "তো সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে যে ৮টায় বাস আসবে । সবাই সেইমত এসেছে। বাসও তো ৮টায় চলে গেছে ।" আমি বললাম ,"আমিতো এই খবরটা পাইনি।" ওরা বলল," তোর বাড়ি কোথায় হয়ত জানা ছিল না তাই খবর দেওয়া হয়নি।" সত্যিই তো আমার বাড়ি অনেক দূরে,অনেক ভিতর দিকে। তাই আমি খবর পাইনি আর তাই আমার যাওয়া হল না। "
পলকে অন্ধকার হয়ে গেল পুটুনের ছোট্ট মুখটা। খবর না পাওয়ার পরিবেশটা সে অনুমান করেছিল ঠিকই কিন্তু আশাভঙ্গের কষ্টটা সে বেশ অনুভব করতে পারছে। ইন্টারনেট বিহীন দুনিয়াটা তার অচেনা হলেও এই যাওয়ার আনন্দ আর না যাওয়ার দুঃখ এ দুটোই তার খুব চেনা।
তাদের অনলাইন মিউজিক ক্লাসে তো দিল্লী থেকে শ্রেয়া আসে, তপতী আসে ব্যাঙ্গালুরু থেকে, ঠাম্মির বাড়ি কি আরো দূরে ছিল! পুটুন জানে তখন প্রত্যেকটা দিন ছিল ফোন খারাপ বা ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ থাকলে যেমন হয়, ঠিক তেমন। যেমন হয়েছিল আগের বছর ঝড়ের পরে। টানা ৪দিন ইলেকট্রিক কানেকশন ছিল না, জল আসেনি।সেই রকম। ঠাম্মির গল্প শুনতে শুনতে এরকম অনেক কিছু সে জানে যেমন শ্রীপর্ণা দিদিমণি জানতেন তাঁর ঠাকুমার গল্প থেকে যে ঠাকুমার ছোটবেলায় মেয়েরা ইস্কুলে যেতই না। ঠাম্মি বলে চললেন, "আমার তখন মনে হল আমি যেন এই সভ্য জগৎ থেকে দূরে একটা অন্ধকার জগতে বাস করি। যার সন্ধান কেউ জানেনা।আর এর সাথেসাথেই জীবনের একটা অতীব আনন্দ উপভোগের

সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। তবে তারা এটাও জানিয়ে দিল যে আগামীকাল ছুটি থাকবে। সেটাই তখন আমার কাছে পড়ে পাই চোদ্দ আনার মতো মনে হল।

একদিন পরে যখন স্কুলে গেলাম দিদিমণিরা আমাকে আমার টাকাটা ফিরত্ দিলেন এবং খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। আর এও বললেন এরপর যদি কোথাও যাওয়া হয়, আগে আমাকে খবর দেওয়া হবে এবং আমাকে না নিয়ে যাওয়া হবে না। আমার বাড়িটা যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা এটা ওঁনারা বুঝতে পারেননি।

"দিয়েছিল খবর পরেরবার?" পুটুনের রাগ ঐ অদেখা ম্যামদের ওপর।

"দিয়েছিলেন বৈকি! সে কথার দাম তাঁরা রেখেছিলেন।পরের বার, ট্যুর হয়েছিল, তখন আমি ক্লাস টেন এ পড়ি। যাদের বিষয় বায়োলজি ছিলো ,তাদের শিক্ষা মূলক ভ্রমণে বোটানিকাল গার্ডেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেবার আগে আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল এবং আমাকে বিনা খরচে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাতেই আমি বাধিত হয়েছিলাম। আমার পঞ্চম শ্রেণীর অপ্রাপ্তি দশম শ্রেণীতেপূর্ণ হল।"

"বাহ্, দেখলে ঠান্মি , ঐ যে তুমি বল না, কোন কিছুতেই দুঃখ পাবি না, আবার হবে। তাই হল। ঐ যে তোমার ঠাকুরের গানটা তুমি গাও

লহঙ্গ ভাঙিয়া পড়ে, লহঙ্গ উঠে.."

"লহঙ্গ নয় সোনা, তরঙ্গ। তরঙ্গ বা লহর মানে ঢেউ । তুমি তো ঢেউ দেখেছ , পুরীতে। একটা পারে এসে মিলিয়ে যায় তো সমুদ্রে আবার একটা ওঠে।"

"রাইট, রাইট। পারের টা তোমার ক্লাস ফাইভ আর সমুদ্রেরটা ক্লাস টেন"

এ কার মুখে কথা শুনছেন শ্রীপর্ণাদেবী! সেদিন তো এভাবেই ঠাকুমা বলেছিলেন তাকে, "তরঙ্গ মিলায়ে যায় , তরঙ্গ উঠে…. পুটুন, মন খারাপের কি আছে? আবার ইস্কুল থেকে নিয়ে যাবে, তখন যাবি।"

সেদিনের সেই ছোট্ট পুটুন আজকের ৭০ বছরের শ্রীপর্ণা দিদিমণি।জীবনের সবচেয়ে আদরের তাঁর ঠাকুমার ডাকটা তিনি যত্ন করে আগলে বেড়াচ্ছেন। এত স্নেহ আর কোন ডাকে তিনি পাননি জীবনে। তাই তা দিয়ে রেখেছেন আদরের নাতনিটিকে। সাথে অজান্তেই দিয়ে দিয়েছেন আরোএক সম্পদ , এই খুদে উত্তরাধিকরীটিকে- বিরাট এক দেবত্ত সম্পত্তি। নাহ্,আর কোন চিন্তা নেই তার।

"তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে

কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে"

বাইরে বৃষ্টিটা কমে এল।

SARTAJ
Taste The Real Origin
since 2006
Importer & Distributor of Indian Spices and Grocery
Bringing best of Indian Brands to Japan
BRITANNIA
DELICIOUS RANGE OF BISCUITS
MOUTHWATERING JUICES & NECTARS
DENVER
THE REAL SCENT OF SUCCESS
Perfection for Cooking Starts with Right Grain
Mother's RECIPE
TASTE THE LOVE
PRESENTING THE REAL TASTE OF INDIA
Shop Online in Categories of:
• Spices • Beans • Pulp & Juices • Herbs • Dry Leaves • Non-Food
• Oil & Ghee • Atta • Rice • Dry Fruits • Chutneys • Alcohol
• Ready-to-Eat • Snacks & Biscuits • Pickles • RTC • Frozen
• Cosmetics • Healthcare • Superfood • General
Easy-to-shop Online
Nation-wide Delivery
Great Weekly Deals
HI-QUALITY ASSURED
• All our products are 100% Veg and suitable for vegetarians.
• Vegan products are also available online at Sartaj Foods.
• Also shop variety of cosmetics, beauty, & health products.
• We offer fast and secure delivery to all the regions of Japan.
〒563-0043 Osaka-fu, Ikeda-shi, Kouda 2-10-23 • Tel: 072-751-1975 • Fax: 072-751-1976
www.sartajfoods.jp • email: info@sartajfoods.jp

Inakadate: The Savior Rice Art

Sugam Ghosh

"Creativity is seeing what others see and thinking what no one else ever thought."
Albert Einstein

On a summery effervescent afternoon, a man stood by the window of Inakadate Town Hall expanding his watch to the adjacent rice fields where children playing rice sowing game. In a trice, he realized kids exploring colorful rice samplings to draw patterns of their own.

The man paused and gathered oneself before muttering 'Tanbo Art/田んぼアート. Mr. Koichi Hanada just invented the infamous survival tactics what apparently been the bread-and-butter for 7,766 farmer population of the village i.e. rice cultivation but with a pinch of artistic element.

This time-poor town hall of a sweet, picturesque Japanese small town of Inakadate, situated at the top of Japan's largest island, Honshu under the foothill of mount Iwate facing two mammoth challenges to overcome –population decline & ever-mounting debt of US$106 million (in 1990) largely contributed by the failed attempt to built an amusement park based on New Stone Age history. Even though blessed with the fertile Tsugaru plain of Aomori Prefecture, a region famous for its rice production, the dept kept on mounting. Mr. Hanada perceived with this brilliant idea of transitioning rice fields into a real-life canvas art, successfully gathered 20 volunteers (read his colleagues from Town hall) in 1993. He managed to hand-plant an entire rice field with an ambitus aim to depict Mount Iwaki with two colors. As usual, the results were disappointing in terms of color as well as depiction accuracy. But unwavering Mr. Hanada took it as a challenge & reached out to wider farmer community of the village. Looking at those veracious eyes, villagers relied on his dedication. The response was overwhelming, hundreds of villagers including high school children volunteered to help with the project, and literally made it as a celebrated community event.

Rest is history, these breathtakingly massive starchy masterpieces draw flocks of tourists all over the world generating an unprecedented revenue. Eventually overcome all of decade old town debts and revamped the economy to the brighter side within a blink of eye. Starting with Emperor and Empress visit back in 2014, this village never looked back. At its height, 2016's Godzilla rice art attracted 340,000 visitors in one year. In 2017 alone, there were 1,300 participants who turned out just to create the art, including those local art teachers, students, city planners, and more. In a town of less than 8,000, that is a lot of enthusiasm for the project, and it's necessary – covering 15,000 square meters with seedlings is a lot of work.

Blessed with a temperate climate with ample rainfall, ideal for paddy cultivation, rice production never been a challenge to this community. Agriculture has been the backbone of the local economy for over two millennia, with rice farming being a core livelihood. However, venturing into an artistic improvisation, a different ball game all together. But the undefeated essence of rural Japan, a close-knit community with deep respect for seasonal cycles, nature, and tradition easily assimilate the fundamental of rice art technique.

Now talking about initiation to execution, the whole process is time consuming, dedication-demanding, intrinsic in nature. Of course, you can break it down to execution phases very similar to Software Development Life cycles.

a. **Design Phase**

Each year, once village committee selects a theme, artists and local volunteers work together to create a detailed digital blueprint of the image which could be a Hollywood celebrity, an infamous movie flier etc. The design must account for perspective distortion — because the artwork will be viewed from an observation deck, the lower parts of the field must be stretched in the design so that the image appears proportional when seen from above.

Former high school art teacher Atsushi Yamamoto has played a significant role in developing the design methodology. Original images – whether photographs, film stills, or classic paintings – are digitized and

adapted using computer software. Yamamoto and the design team simplify complex color schemes down to the roughly seven achievable hues provided by the selected rice varieties.

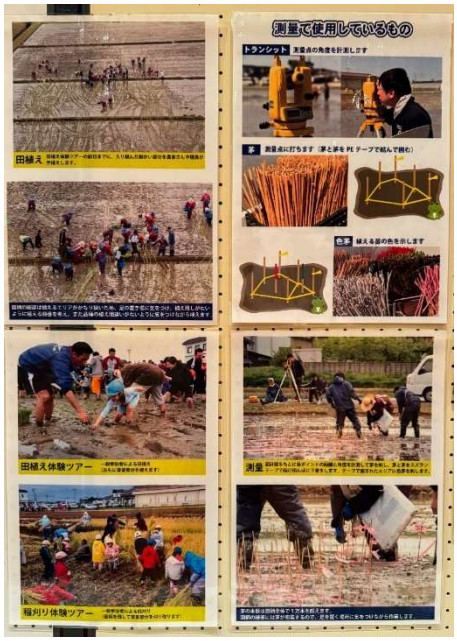

b. **Planting**

After the paddy fields are flooded and leveled, planting lines are carefully marked using ropes, stakes, and GPS-based measurements.

Volunteers, including local residents, schoolchildren, and visitors, plant the rice seedlings by hand according to the plan. The rice varieties are chosen based on their leaf and grain colors, which range from bright green to deep purple, yellow-green, and reddish-brown.

c. **Maintenance**

Over the summer, farmers carefully tend the paddies, managing water levels, weeding, and ensuring optimal growth. As the rice plants mature, the colors intensify, and the artwork gradually comes to life. By July and August, the images reach their peak vibrancy. The whole rice cultivation is quite stressful & attention-depending.

This living palette includes standard green edible rice, along with ancient rice varieties (kodaimai) like the purple 'Murasaki Daikoku' and yellow 'Kiyo Daikoku', plus other strains providing shades of dark green, red, orange, and white (like the ornamental 'Yuki-asobi'). Some sources suggest the use of "upland" rice varieties, which may not require constantly flooded paddies, potentially simplify the planting process and allow for greater precision in the final image.

Some commonly used types include:

- Tsugaru Roman & Asayuki – A green-leafed variety forming the base of the intrinsic paddy art
- Murasaki Ine/Daikoku – Purple rice, mainly used to draw bold outlines and shadows to introduce picturesque design
- Odaikoku or Yellow-leafed varieties – Used as a highlighter and use to exclusively differentiate lighter areas.
- Midori Daikoku – Representing layers of greenery
- Yukiasobi – reflects the snow-white nature colors
- Akane-asobi – The orange fillers
- Beni asobi – Red rice grains, Adding warmth and depth to the image.
- Shihonami – this bright purpose colored rice introduces contract in the overall image
- Ahonami – Another shed of red
- Shirahonami – Touch of off-while

By carefully combining these varieties, artists can achieve nuanced shading, creating the illusion of depth and texture, sometimes even a 3-D representation as well in the rice-field.

The exponential design journey: Iwaki Mountain to Mona Lisa and Beyond

From its humble beginnings, Inakadate has undergone a remarkable evolution. For the first nine years, the design remained a simple depiction of Mount Iwaki. However, the village soon began experimenting with far more complex and ambitious themes.

This journey involved learning and adaptation. A notable example is the 2003 attempt to recreate Leonardo da Vinci's "Mona Lisa." When viewed from the observation tower, the perspective was off, making the famous portrait appear distorted or "chubby". This challenge spurred innovation. The organizers turned to technology, developing methods using computer modeling to create drafts that corrected for perspective, ensuring the images appeared proportional when seen from above. This technical leap paved the way for the incredibly detailed artworks seen today.

Over the years, the rice paddies have hosted a stunning array of images, reflecting both Japanese culture and global icons:

- Hokusai's iconic woodblock print "The Great Wave off Kanagawa" (2007)
- Historical figures like Napoleon (2009)
- Hollywood stars like Marilyn Monroe (2013) and scenes from "Roman Holiday" (2018) and "Gone With the Wind" (2015)
- Pop culture phenomena such as Star Wars (multiple years, including 2015 and 2017) and Godzilla (2016)
- Beloved anime and manga characters like those from One Piece (2023)
- Famous European paintings like Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" (2023)

- Themes for 2024 included depictions related to the new ¥1000 bill (Kitasato Shibasaburo and Hokusai's wave) at Venue 1, and art based on the manga "Grandma and Grandpa Rejuvenate" at Venue 2.
- "Inakadate Village 70 Years of Miracles" and the movie "Delicious School Lunch: School Trip on Fire" (2025)

In fact, Inakadate even evolved to introduce stone arts such as a portrait of Shiko Munakata in 2025.

Getting to Inakadate

Finally, you reached to most important or shall I say informative section of this discussion i.e. transit or transportation information to witness this meticulously designed art all by yourself.

If you pursue local transit, remember the final disembark would be Tanbo Art Station. Yes, you heard that right, the Inakadate town planning department inaugurated a dedicated rail station to encourage tourists to witness their paddy magic.

From Tokyo metropolitan area, take the Tohoku Shinkansen Hayabusa (Japan's fastest commuter Shinkansen) from Tokyo Station to Shin-Aomori Station. Get off, follow the sign for about 5-7 minutes' walk to the JR Ou Main Line & head to Hirosaki Station (the station famous for Hirosaki Castle), then transfer to the Konan Railway Konan Line for final destination Tanbo Art Station.

Important point to remember is, there are currently two Tanbo art viewing point in operation. The 2nd

observation deck i.e. Yayoi no Sato Observatory is about 5 minutes' walk from the station. Recommended to walk these 5 minutes through the lash green rice fields, smell the serene nature at its' best & if lucky, watch the next local train zip through the greenery.

Once you reach the entrance of watch tower, familiarize yourself with the ticket vending machine, polite attendants are always at your service. Adult entrance cost 300 yen whereas high school students to pay 100 yen.

From here, you will get a free shuttle bus Tasaabei (capacity: 9 people) runs every 30 minutes to take you to 1st venue. Given Yayoi-no-Sato Observatory is about a 5-minute walk from Tanbo Art Station, it's best to first view the 2nd rice paddy art and then take the bus to the 1st rice paddy art venue.

Even the 1st venue i.e. Town office building bearing the shape of a traditional Japanese castle tower requires 300-yen adult entry fees. This modern infrastructure has high speed elevator which takes you to 4th floor or to the observation deck. There are two best photographic corners marked with transparent glass, you should explore them happily.

Overall, you should reserve 2-3 hours for a relaxed trip covering both paddy art sites. If wish to save a 30 minutes' walk to Tanbo Art station from 1st venue, board a return bus back to 2nd venue & take much shorter 5 minutes' walk. There are few eateries, canteen in both venues so munching local onigiris (rice balls) or some fancy cuisines is a good add on. I personally found the used art supplies store near 1st venue quite interesting, bought a couple of old Tanbo art frames & few more decorative woodworks at a dart cheap price.

To summarize, this fusion of nature and art, beautiful colors born from ears of rice, rice field art is an ultimate expression of the charm of Japanese landscape and art. Visit this wonderful world of art and be enchanted by its beauty.

Key Points to Remember

The paddy art season lasts only between July and September each year, so careful in planning trips.

Also, Konan railways don't have very frequent services so align your plan according to local train schedule.

Ideal would be staying a night at Hirosaki station area & cover both Hirosaki Castle & Inakadate together.

Basic Information

- **Location**

① First Rice Paddy Art
(Inakadate Village Observation Deck)
123-14F Inakadate Nakatsuji, Inakadate Village, Tsugaru District

② Second Rice Paddy Art
(Yayoi no Sato Observatory)
Takahi Izumi, Inakadate Village, Minamitsugaru District

- **Business hours** - 9:00～17:00
- **Fees**
- Adults: 300 yen each
  Children: 100 yen each
- **Parking** – Free Car parking Available
- **Inquiries**

  TEL：0172-58-2111 (extension 242, 243)

  FAX：0172-58-4751

- **Website** http://www.inakadate-tanboart.net/
- **Google Map** https://share.google/QzwXLU2cH1yODTMG5

কপাল

উদয় চক্রবর্ত্তী

বেশ উত্তেজিত হয়ে মোবাইলে কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক পার্কে কয়েক পাক দিলেন আমার সামনে দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে এবার এসে বসলেন বেঞ্চের আমার পাশটিতে। সন্ধ্যা বিদায় নিয়েছে সদ্য। রাত্রি বলা যায়। সন্ধ্যাবেলা পার্কে হাঁটা আমার বহুদিনের অভ্যাস। কয়েক চক্কর মেরে এই বেঞ্চে বসে একটু জিরিয়ে নিই। তারপর এক ভার চা খেয়ে বাড়ি ফিরি।

ভদ্রলোককে বেশ অবসাদগ্রস্ত ও ক্লান্ত মনে হল। শরীর এবং মুখমন্ডল একটু কাঠখোট্টা টাইপের। আমার দিকে চেয়ে একটু দেঁতো হাসি হাসবার চেষ্টা করলেন। আটপৌরে হাসি। আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন "আর পারছিনা মশাই, মনে হয় সুইসাইড করতে হবে"। আমি কান পাততেই "সুইসাইড" কথাটা শুনে সিরিয়াস হয়ে গেলাম। বলে কি এই বয়সে সুইসাইড!! ভদ্রলোক বলে চললেন "মেয়েটা দু'দিন হল বেপাত্তা, আমার গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্ময়ে আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। আমি অচেনা মানুষ তায় ঘরের সমস্যার কথা আমাকে বলার কারণ কি! ভাবলাম ভদ্রলোকের মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে মনে হয়। নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কোন কথা বললাম না ফেঁসে যাবার ভয়ে।

ভদ্রলোক আবার বলে চললেন "ঠিক দেড়মাস আগে এক ছোকরার সাথে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিস ধরে নিয়ে এলো দীঘার এক হোটেল থেকে। কি লজ্জার ব্যাপার বলুন তো"। তারপর দুজনে চুপ। আজ বেশ গরম পরেছে তার উপর আবার এইসব কথা। বোকার মত ফস করে বলে বসলাম "দেখবেন মেয়ে ঠিক ফিরে আসবে"। ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলে উঠলেন "আপনি কি করে জানলেন আমার মেয়ে ফিরে আসবে"?

তাইতো আমি কি করে জানব যে ওনার মেয়েটা ফিরে আসবে। ভদ্রলোকের উৎকন্ঠা দেখে আমার একটু অনুকম্পা হচ্ছিল তাই কথাটা বলতেই এবার বুঝলাম আমি ফেঁসে গেলাম বোধহয়। ওনার মেয়ে পালিয়েছে তো আমার কী। আশাকরি থানা পুলিশ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একে মেয়ে পালানো কেস তায় থানা পুলিশ আর এদিকে সুইসাইড তো আছেই। আমি আর ভাবতে পারছি না। এবার মানে মানে কেটে পড়তে পারলে বাঁচি।

ভদ্রলোক বেশ কড়া স্বরে বলে উঠলেন "আমি মিলিটারির মেজর ছিলাম। কত দাপট ছিল, আর এখন রিটায়ার করে ঘরে বসে থাকি। ওয়াইফের ফাই ফরমায়েশ খাটি। কোন সম্মান নেই। ওয়াইফ, মেয়ে কেউ আমাকে পাত্তাই দেয় না, ধকমে চুপ করিয়ে দেয়। সংসারে শান্তির বজায় রাখতে মুখ খুলতে সাহস হয়না। কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না মশাই। বাড়িতে আমার সারভিস রিভলবার আছে, এবার মাথায় চালিয়ে দেব তবে শান্তি পাব"।

আমি শিউরে উঠলাম। বলে কি? 'মাথায় গুলি চালিয়ে দেবে'! আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে এলো। এমনিতে আমি নির্ব্বিবাদি মানুষ, কারো সাতে পাঁচে থাকিনা, ভিতু টাইপের এবং লাজুকও বটে। বন্ধু খুব কম। চট করে অচেনা লোকের সাথে আলাপ করতে পারিনা।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ দম্ মেরে বসে থেকে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলেন "জানেন মেয়েটা আমার বড় ভালো ছিল। পড়াশোনায় ভালো, সাঁতারে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান, একটা ভালো চাকরিও করে। আমার ওয়াইফ ওর সর্ব্বনাশ করেছে। বাড়িতে সুন্দরী মেয়ে থাকলে যা হয়... ছেলে-ছোকড়াদের অবাধ আসা-যাওয়া। ওর মা তাদের খাতির করে। চলে হাসি ঠাট্টা, খাওয়া-দাওয়া। বারবার আপত্তি জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। উল্টে মা-মেয়ে মিলে আমাকে যাচ্ছেতাই করে চেপে বসিয়ে দেয়"।

এতক্ষন আমরা কেউ কাউকে চিনিনা কিন্তু অনেক কিছু জানা হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন "আমার বড় বিপদ। আপনাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে তাই নিজের প্রবলেমের কথা আপনাকে বলে ফেললাম। ভেরি সরি, কিছু মনে করবেন না। আমি মেজর এস,কে,মিত্র"। ইতিমধ্যে আমি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। বললাম "আমার নাম চাঁদু বোস, এই কাছেই আমার বাড়ি"। উনি বললেন " ওই যে দেখা যাচ্ছে মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং ওখানে ৭ তলায় আমার ফ্ল্যাট" চলুন আমার ফ্ল্যাটে এককাপ কফি খাওয়াবো।

আগমনী

এবার আমি বেশ ভয় পেলে গেলাম, চেনা নেই জানা নেই, কোনো পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা। মতলব কিছু ঠাওর করতে পারলাম না। একে মেয়ে পালিয়েছে বাড়ি থেকে তার উপর আবার সারভিস রিভলবার। সুইসাইড কেস। কি জানি রিভলবারের টিপ প্রাক্টিস করবার জন্য আমার মাথাটা তার পছন্দ হল কিনা। শেষে বেঘোরে প্রাণটা যাবে। আর কিছু ভাবতে পারছি না। ভয়ে হাত-পা কাঁপছে। বললাম "না না আমার যাওয়া হবে না। চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল, নির্জলা মিথ্যে করে বললাম "আমি পপ্রাইভেট টিউশনি করি, ছাত্রদের আসার সময় হয়ে গেছে। দেরি হলে বসে থাকবে। সামনে পরীক্ষা, কত ক্ষতি হবে বলুন তো। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে"। ভদ্রলোক মিলিটারি মেজাজে বললেন "ছাড়ুনতো টিউশনি- আজ আমার ফ্ল্যাটে যেতেই হবে"। অমন হুংকার শুনে ভয়ে এবার আমার কাপড়ে চোপড়ে হবার অবস্থা। আমি কিছুতেই যাবনা আর উনি ছাড়বেন না। যমে-মানুষে টানাটানি। এবার আমি লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে প্রায় তার হাতে-পায়ে ধরে সে যাত্রায় কোনো মতে নিস্তার পেলাম। হনহন করে হাঁটা লাগালাম বাড়ির দিকে।

পরের দিন মেজর সাহেবের ভয়ে আর হাঁটতে গেলাম না। যদি আবার দেখা হয়ে যায়। রক্ষে থাকবে না। গেলাম তার পরের দিন। হাটাহাটির পর বসলাম গিয়ে পার্কের অন্য প্রান্তে ঘুপচি অন্ধকারে এক বেঞ্চে। বলাতো যায় না- সাবধানের মার নেই।

ব্যাপারটা ঘটলো অন্যরকম- মেজর সাহেব দূর থেকে ঠিক দেখতে পেয়েছেন আমাকে, ছুট্টে এসে জোর করে আমাকে দাঁড় করিয়ে একেবার জড়িয়ে ধরলেন। খুব হাসিখুশি দেখে আমি বললাম "গুড ইভিনিং"। উনি বললেন "আপনিতো মশাই একেবারে ভগবান"। আমি ব্যপার-স্যাপার বুঝতে না পেরে ক্যবলার মত চুপ করে রইলাম।

এবার খুশির খবর দিলেন "আপনার কথাই ফলে গেল, মেয়ে এক মন্দিরে বিয়ে করে জামাইকে সঙ্গে করে পরশু রাতেই ফিরে এসেছে। খাসা জামাই হয়েছে মশাই। ভালো ফ্যামিলি, রোজগার ও ভালো। আমার মেয়ে বেশ চালাক চতুর আছে, কি বলেন? আমার ভয়ে বিয়েটা মন্দিরে করে আসলেও আমি কিন্তু একটা বড় পার্টি দেব। আপনি কিন্তু স্পেশাল গেস্ট থাকবেন। আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ছি না। মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করে তারপর আপনার ছুটি"। মনে মনে ভাবলাম- আমি একজন অজানা অচেনা নিরীহ গোবেচারা মানুষ। কোন হরিদাস নই, আমি যাব মেজরের মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করতে! অবাক কান্ড। আমার কোন ওজর-আপত্তি টিকল না, অগত্যা যেতেই হল তার ফ্ল্যাটে।

সুন্দর পরিবার। সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। বেশ স্বচ্ছল। মেয়ে অর্থাৎ নববধূ আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো, জামাইও করলো। সকলের শরীরে আভিজাত্যের ছাপ। কিন্তু মুস্কিল হল প্রণাম তো নিলাম কিন্তু আশীর্বাদ স্বরূপ কিছু উপহার দেওয়া একান্ত কর্তব্য। পকেটে পড়ে আছে মাত্র একটা ১০টাকার কয়েন। বাড়ি ফেরার পথে দুলালের দোকানে একভাড় চা খাই। মোবাইল এযাত্রায় আমার মান রক্ষা করল। জী-পে করে নববধূর একউন্টে ১ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

আতিথেয়তার ত্রুটি নেই। মিষ্টি দিয়ে শুরু করে কফি এরমধ্যে চলেছে তাদের পরিবারের কথা, গল্প। ওরা পরিবারের সবাই মন খোলা মানুষ। আজকাল এমন বড় একটা দেখা যায় না। মেয়ে জামাই দেখে আমার বেশ পছন্দ হল। মনে মনে ভাবলাম আমার ঘরে বিয়ের যোগ্য মেয়ে রয়েছে। কিছুতে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারছি না। ঝাঁকে ঝাঁকে পাত্রপক্ষ দেখে যাচ্ছে তারপর আর কোন খবর দেয় না।

কথা শেষ হলে উঠি উঠি করছি এমন সময় মেজর সাহেব আমাকে জোড় করে তার পার্সোনাল ঘরে নিয়ে গেলেন। আলমারি থেকে বোতল, গেলাস বার করলেন। ওয়াফকে চাটের ব্যাবস্থা করতে হুকুম দিলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি। একেবার খাস বিলিতি স্কচের বোতল। আমি খুব একটা পান করিনা। গিন্নি আপত্তি। বিশেষ অকেশনে একটু-আধটু পান করেছি বটে কিন্তু তার ফল মোটেই আনন্দদায়ক হয়নি।

স্কচ দেখে লোভ হল। আগে কখনো জোটেনি। ভদ্রতার আপত্তি করাও আর হয়ে উঠলো না। একটি কাজের মেয়ে প্লেট সাজিয়ে বিভিন্ন অনুপান টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে গেল। ভদ্রলোক গেলাসে ঢেলে আমার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিলেন, নিজেও নিলেন "চিয়ার্স" বলে অট্টহাসি হাসলেন। আমি ফিক করে একটু হাসলুম।

এমন সময়ে গিন্নির ফোন এলো। ধরলাম। হাজার প্রশ্নবান। আমি কেমন বেপরোয়া হয়ে বললাম "বন্ধুর হার্ট এটাক। হাসপাতালে আছি। ফিরতে দেরি হবে"। আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মোবাইলের সাউন্ড অফ করে রাখলাম।

এ,সি চালিয়ে ঠান্ডা ঘরে এরকম পরিবেশে মন্দ লাগছিল না। চললো টুকটাক গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা। মদ্য পান চলছে ক্রমে নেশা চেপে ধরছে। মনে ভেবে রেখেছি এসব স্কচ কখনো জোটেনি। তাই আকন্ঠ পান করব।

আসর যখন শেষ হল তখন ঘড়িতে সারে এগারোটা। আমার বেশ টলোমলো অবস্থা দেখে মেজর সাহেব বললেন “চলুন গাড়ি করে আপনাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসি”। আমি আপত্তি করলাম। “তার দরকার হবে না, এই কাছেই তো বাড়ি আমি ঠিক চলে যেতে পারব”। টলতে টলতে ফিরলাম পাঁচ মিনিটের পথ আধ ঘন্টায়। বাড়ির দরজা খুলতেই রুদ্র মূর্ত্তি গিন্নি “কোন চুলোয় যাওয়া হয়েছিল? ও মা ছিঃ ছিঃ মদ গিলে এসেছে গো। আমি কোথায় যাব গো"। হল্লা শুরু করে দিল। পাড়া পড়শী পর্যন্ত জেনে গেল আমি মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরেছি। মেয়ে ঘর থেকে ছুটে এসে দূর থেকে আমাকে পরখ করল। মুখে কিছু বলল না। গিন্নি হঠাৎ আমার চুলের মুঠি ধরে হিরহির করে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে সাওয়ারটা চালিয়ে দিল। গালিগালাজ তো চলছেই। এবার বাথরুমের দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

বাপ সোহাগী
কল্পনা চক্রবর্ত্তী

ছোট্ট, মিষ্টি, দুষ্টু মেয়ে,
বাপের কাছে যায় ধেয়ে,
করতে হবে নালিশ কত,
মা তাহারে বকেছেন যত।

ছোট্ট দুটি বাহুর ঘেরে
জড়িয়ে ধরে বাপের গলা,
এত দিনের জমা-কথা,
সব এখনই চাই যে বলা।
বাবা থাকেন দূর প্রদেশে,
ঘরে ফেরেন মাসের শেষে।
নালিশ তাই জানায় কাকে?
মা যে তারে কেবল বকে।
পড়তে বকা, খেতেও বকা,
পুতুল খেলা, তাতেও বকা।
জিনিষপত্র ওলোট-পালট,
তাতেও চলে মায়ের দাপট।
বাবা এলে ভারি মজা,
বন্ধ থাকে সকল সাজা,
বাবার সে তো চোখের মনি,
শুধুই স্নেহের খুকুমনি।
সে তো আবার পিতৃ - মুখী,
বাপের কোলে সদাই সুখী।
বাবা তো তার নয়কো রাগী,
সবাই বলে বাপ্ - সোহাগী।

শরতের আবাহন
অশোক কুমার দাস

নদী নির্ঝর ধ্বনি মর্মর পশু পাখি-কুল বৃক্ষমূকুল
বনে বনে তারা মনে মনে তারা কথা কয় অবিরত
সে কথার সুর বহে যায় দূর দীঘি জল কুলু কুল
বনচারী কবি কন্ঠের ধ্বনি সাজায় মনের মত।
সেই সুর তালে কণ্ঠ মিলিয়ে বাতাস বহে সুরে
উদাস সে সুর উতালা বিধুর লতা পাতা ফুলে দলে
সেই গান মেশে সোনা রোদে এসে শিশির হয়ে ঝরে
সেই সুর তাল তটিনী অঙ্গে নূপুর ছন্দ তোলে।
আগমনী গান ভরেছে পরান আবহের স্রোতে স্রোতে
ফিরে ফিরে আসে ঘুরে ঘুরে ভাসে শরতের কাশে কাশে
শিউলি সুবাস আমনের বাস সবুজের ভরা ক্ষেতে
মেঘেদের ভেলা ভাসে সারাবেলা শরতের নীলাকাশে।

অজরা অতুলা
কেয়া ভট্টাচার্য্য

অতুলনীয়া তুমি, তোমার বয়স বাড়তে পারে না
যুগে যুগে তাই অসুর কবল তোমায় ছাড়ে না
আজও পুজা করে, আনন্দে মাতে,সাজে বরণডালা
আজও গান ভাসে, বন্দনা সুরে- অজরা, অতুলা।

অমরগাথায় দৈত্যনিধন, তুমি তো অপরাজিতা
তবু ঘটে চলে সেদিনের সেই শুম্ভ নিশুম্ভ কথা
সব প্রজন্ম সাক্ষী যে হয় তাদের প্রলয়লীলা
ভক্তকন্ঠ একইভাবে ডাকে - অজরা, অতুলা।

বিজিত তো মাগো তুমি ছিলে তাই পুরাণকাহিনী রচনা
পরাজিত সেই অসুর তো আছে, তোমাকে দেখতে পাই না
দেবী নও তুমি, মা বলি, যার ভাষায় প্রথম বলা
আগমনী হোক শাশ্বত, হোক অজরা, অতুলা।

রচনা কি তবে ভুল ছিল, নাকি আমরা জাগতে জানি না
মৃন্ময়ী করে রেখেছি শুধুই, চিন্ময়ী হতে পারি না
সবার মাঝেতে তুমি জাগো মাগো, সত্যের জয়মালা
শুভ শারদীয়া, প্রণমি বরদা, অজরা, অতুলা।

ছবি : মৌমিতা রায়চৌধুরী

Hindi Translation of **Rabindranath Tagore's Poem** প্রতীক্ষা (**Pratiksha**)

Nitin Srivastava

(Tagore has viewed the perspective of man and his Creator towards time through the prism of relativity.)

हे देवों के देव, तुम्हारे हाथों में समय अपार है
गिनती के परे, रात और दिन निरंतर गुज़रते हैं
कई युग युगांतर एक पुष्प की तरह खिलते और बिखरते हैं ।

तुममे ना विलंब है, और ना है अधीरता,
तुममे है ठहराव |
सत वर्षों से तुम हर एक कली को अपने संरक्षण में आहिस्ते आहिस्ते पुष्पित करते आए हो ।

समय हमारे हाथों से परोक्ष है
अतः संघर्ष में सभी विलीन हैं
और विलंब हमें असहनीय है
प्रभु, सब सीमित करते करते समय कट जाता है
सूनी रह जाती है, हाय, तुम्हारी पूजा की थाली
और जब विचलित होकर तुम्हारे समक्ष आता हूँ, मन में एक भय के साथ,
तो देखता हूँ समय वहीं अविरल विराजमान है !

VISHWAS®
YOUR TRUSTED PARTNER
VISHWAS CO. LTD.
YOUR TRUSTED PARTNER
Import, Export & Distributor of Spices
If it's about spices, go to VISHWAS!
READY TO EAT CURRY
BLENDED SPICES
PICKLES
WHOLE SPICES
DRY FRUITS
BEANS
BOTTLE SPICE
SWEETS & SNACKS
Hyogo-Ken, Amagasaki-Shi, Tonouchi-Cho, 2-1-7
〒661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内 町 2-1- 7
Tel. 06-6493-7888 | Fax 06-6493-7885
www.vishwasjapan.com | Email: vishwasjapan@gmail.com
ORDER NOW

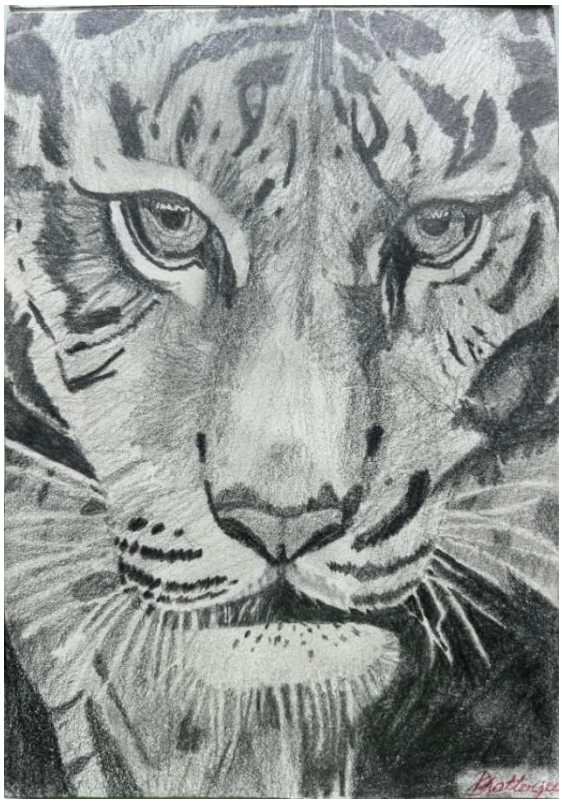

ছবি : ধ্রুপদ চ্যাটার্জী

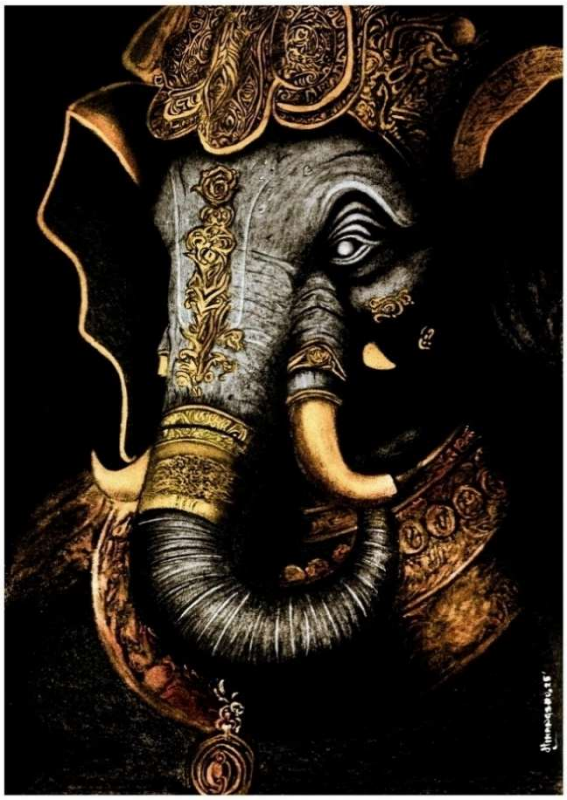

ছবি : হিমাংশু ব্যানার্জী

Feluda in Tokyo
Emotion and gratitude for having to witness Feluda in Tokyo. A big occasion in my life, first time seeing Feluda in big screen and that too with my son (Ayushmit-Popeye) in Tokyo!!!

Durjay Biswas

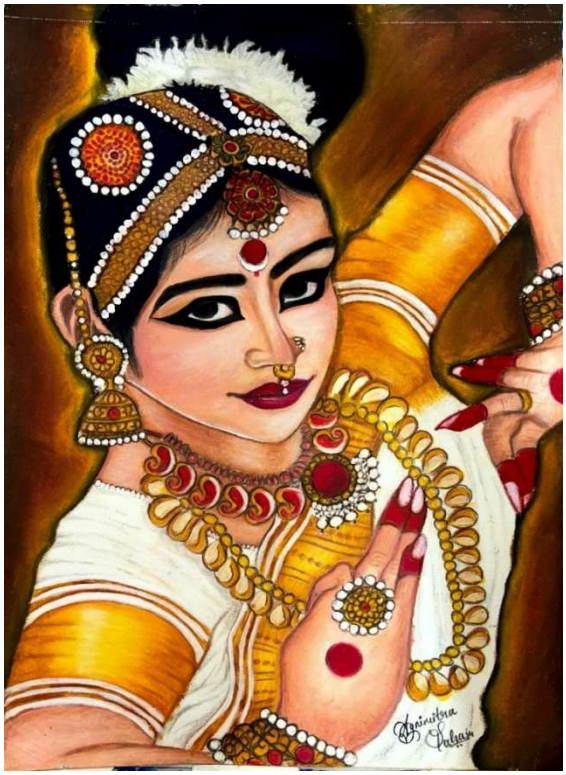

ছবি : অগ্নিমিত্রা সাহা

প্রহেলিকা

এনাক্ষী মিশ্র

আমি তৃণা। ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে বসে আছি। একদিন আমার জ্যেঠু এসে বললেন আমি "দু দিনের কাজে গৌহাটী যাচ্ছি। উঠবো আমার বন্ধু ব্রজেন ভট্টাচার্যের বাড়িতে। যাবি নাকি আমার সাথে? তুই তো বাড়িতেই বসে আছিস।"

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি। "তোমার এই বন্ধুর পরিবারই তো কোন এক আহোম রাজার বংশানুক্রমিক পুরোহিত, তাই না?"

"হ্যাঁ রে। তোর মনে আছে দেখছি" জ্যেঠু বলেন।

"আরও মনে আছে। তুমি বলেছিলে ওদের বাড়ির মাটি খুঁড়লে এখনও অনেক প্রাচীন মূর্তি বের হয়।" আমি বলি।

জ্যেঠু বলেন "সেই রাজবাড়ির কোন চিহ্নই আজ আর নেই। প্রধান মন্দির আর নাটমন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে। পুরোহিতের থাকার জন্য যে বাড়িটা ছিল ওরা এখনও সেটাতেই থাকে। নিয়মিত সংস্কার করা হয় বলে ওটা এখনও টিকে আছে। মাটি খুঁড়ে অনেক মূর্তি বেরিয়েছিল। ওরা সেগুলো গৌহাটী মিউজিয়ামে দিয়ে দিয়েছে। তবে ছোট ছোট কিছু মূর্তি এখনও ওদের বাড়িতে আছে।"

ছবি : সুকন্যা মিশ্র

উৎসাহে, আনন্দে, উত্তেজনায় আমার বুকটা ধক্ ধক্ করতে থাকে। একটা ছোট ব্যাগে আমি দু দিনের মত জামাকাপড় গুছিয়ে নিই। পরদিন সকালে রওয়ানা হয়ে দুপুরে গৌহাটী পৌঁছে যাই। বাস ষ্ট্যান্ড থেকে অটো ধরে ওদের বাড়ি পৌঁছুতে বেশি সময় লাগলো না।

ওদের বাড়িতে পৌঁছে আমি প্রচন্ড মানসিক ধাক্কা খেলাম। এই বাড়ি আমার এত চেনা কেন? বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই দুর্গা মায়ের মন্দির এবং নাটমন্দির। সেই লাল মেঝে আর লাল দেয়াল। মন্দিরের ডান দিকে আরও রুম ছিল বোঝা যায়। এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। বাঁ দিকের রুমটা ঠিকঠাক আছে এবং ব্যবহার হয় বোঝা যাচ্ছে। এর বাঁ দিকে একটা প্যাসেজ আছে যেটা দিয়ে পেছনের বাগানে যাওয়া যায়। এই প্যাসেজের বাঁ দিকেই পুরোহিতের থাকার বাড়ি। আমার মনে হল এই বাড়িতে আমি থেকেছি। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? আজই তো প্রথম এখানে এলাম।

ব্রজেন জ্যেঠুর বড় ছেলে দ্বিজেনদা চাকরি করে। কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাবাকে পূজোর কাজে সাহায্য করে। জ্যেঠুর মেজ ছেলে বীরেনদা কলেজে পড়ছে। সে ও বাবাকে তাদের বংশানুক্রমিক কাজে সাহায্য করে। জ্যেঠুর ছোট মেয়ে সুতপা একেবারে আমার বয়সী। সে ও ক্লাস টেনের পরীক্ষা দিয়েছে। আমার সাথে খুব ভাব হয়ে গেল। আমি ভাবলাম ব্যাপারটা সুতপাকে বলা যায়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া মিটলে পর আমি আর সুতপা ওর রুমে বসে গল্প করছি। তখন আমি বললাম "একটা অদ্‌ভুত ঘটনা ঘটছে। তোদের সাথে আমার তো এই সবে পরিচয়। এই প্রথম তোদের বাড়ি এলাম। কিন্তু এই বাড়িটা আমার খুব চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে এই বাড়িতে আমি থেকেছি। মন্দিরের ডান দিকে তো ভাঁড়ার ঘর ছিল, তাই না? বাঁ দিকের এই রুমটাতে ঠাকুরের ভোগ রান্না হত।"

সুতপা চোখ গোল গোল করে শুনতে লাগলো। সে বললো "এখন এই বাঁ দিকের রুমটাই ভাঁড়ার ঘর এবং ভোগ রান্নার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্তু তুই এ সব জানলি কি করে? দাঁড়া, সবাইকে ডাকছি।"

সে চীৎকার দিয়ে সবাইকে ডাকলো। আমার জ্যেঠু, ব্রজেন জ্যেঠু, জ্যেঠিমা, দ্বিজেনদা, বীরেনদা সবাই ছুটে এলো। সুতপার মুখে সব কথা শুনে সবাই তো হতবাক।

দ্বিজেনদা আমাকে জিজ্ঞেস করলো "তোমার আর কি কি মনে পড়ে? একটু মনে করার চেষ্টা কর।"

আমি বললাম "খুব আবছা মনে পড়ে, একটা রাজবাড়ি। সেই বাড়ির রাজকন্যা আমার সমবয়সি ছিল। তার চেহারা বা নাম অবশ্য মনে পড়ে না। তবে আমরা একসাথে খেলতাম। একবার দুর্গা পূজোতে মহারানি তাঁর মেয়ের সাথে আমাকেও একটা দামি মেখলা-চাদর উপহার দিয়েছিলেন। আমি অষ্টমী পূজোর দিন সেটা পরেছিলাম। আর কখনও পরিনি। ভাবতাম নষ্ট হয়ে যাবে। তা ছাড়া একজন পুরোহিতের মেয়েকে এত দামি পোষাক মানায় না।"

সবাই বিস্ময়ে হতবাক। আমি বললাম "আমি একটু ঐ বাগানে যেতে চাই।"

সবাই মিলে গেলাম বাগানে।

আমি বললাম "মন্দিরের পেছনে ঐ বটগাছটা আগে ছিল না।"

দ্বিজেনদা বললো, "এই প্রকান্ড বটগাছই এই মন্দির আর আমাদের থাকার বাড়িটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। রাজ প্রথার অবসান হল। রাজার রাজত্বও গেল। ধীরে ধীরে রাজ পরিবারের লোকেরা হারিয়ে গেল কালের গর্ভে। রাজবাড়িও ধ্বংস স্তুপে পরিণত হল। এক সময় ব্রহ্মপুত্র এসে সব গ্রাস করে নিল। শুধু এই বিশাল বটগাছের শেকড় মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলো এই মন্দিরকে রক্ষা করার জন্য। এজন্য এই মন্দিরকে সবাই খুব জাগ্রত ভাবে।"

ব্রজেন জ্যেঠু বললেন "রাজার রাজত্ব যতদিন ছিল ততদিন খুবই ভালো চলছিল। তবে পরিবর্তনশীল সমাজের আভাস পেয়ে পরিবারের ছেলে মেয়েরা তার আগে থেকেই পড়াশোনা করে চাকরিতে যোগ দেয়া শুরু করে। মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন আমাদের এই বাসস্থান দেবোত্তর সম্পত্তি বলে সরকার হাত দিতে পারেনি। যতদিন আমরা এই মন্দিরের সেবাইত থাকবো, ততদিন আমরা এই বাড়িতে থাকতে পারবো।"

জ্যেঠিমা বললেন "তাই তো দ্বিজু ভোরে উঠে মন্দিরের কাজে বাবাকে সাহায্য করে তবে অপিস যায়। বীরুও পড়াশোনা সামলে যতটা পারে করে। আমাদের পর ওরাই বাঁচিয়ে রাখবে এই মন্দিরের পূজো। তা ছাড়া এই দুর্গা মা কে সবাই এত জাগ্রত মানে দেখে দূর দূরান্ত থেকেও লোকজন এসে পূজো দিয়ে যায়। মন্দিরের আয় যথেষ্ট ভালো। তবে আমরা শুধু আমাদের সাধারণ জীবন যাপনের জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তত টুকুই নিই। বাকি সব মায়ের। তাঁর আশীর্বাদেই আমরা বেঁচে আছি।"

দ্বিজেনদা বললো "বাবা মা, আমার মনে হয় এবার আমাদের পরিবারে যে একটা পুরনো কাহিনী প্রচলিত আছে সেটা উন্মোচন করার সময় এসেছে। এবার হতে পারে রহস্যোদ্ঘাটন হবে।"
বীরুদা ও সুতপাও অবাক হয়ে শুনছে।

"কি রহস্য রে দাদা?" ওরা বলে সমস্বরে।

ব্রজেন জ্যেঠু বলেন "আমি বলছি। মা দুর্গার পেছনের দেয়ালে একটা চৌকো খোপ আছে, অনেকটা ব্যাঙ্কের লকারের মত। ওর ভেতর কিছু একটা আছে। এই খোপের দরজা বন্ধ। আমাদের বংশ পরম্পরায় একটা কাহিনী চালু আছে যে এটার ভেতরে যা আছে তার ন্যায্য দাবিদার যখন আসবে তখন দৈব ইশারাও আসবে এবং এটার মালিকই শুধু খুলবে সেটা। তার আগে যদি কেউ সেটা খোলার চেষ্টা করে তাহলে পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসবে। তাই সেই দরজা কেউ কোনদিন খোলার চেষ্টা করে নি।"
জ্যেঠিমা বললেন "আমারও মনে হচ্ছে রে দ্বিজু এবার বোধহয় সময় হল। এর চাইতে বড় ইশারা আর কি হতে পারে?"

আমার বুকে তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আমিই কি সেই? আমি শক্ত করে সুতপার হাত আঁকড়ে ধরলাম।
ব্রজেন জ্যেঠু বললেন "চল, সবাই মিলে মন্দিরে যাই।"

সবাই মিলে মন্দিরে গিয়ে দুর্গা মা কে প্রণাম করলাম। হঠাৎই আমার চোখে ভেসে উঠলো শত শত প্রদীপে সাজানো আলো ঝলমলে ঠাকুর দালান। আমি বললাম "জ্যেঠিমা তোমাদের কাছে মাটির প্রদীপ আছে? আমার কিন্তু একশো আটটা প্রদীপ চাই।"
জ্যেঠিমা বললেন "আছে তো। অনেক অনেক আছে।"
"ঐ খোপের দরজা খোলার আগে আমি একশো আটটা প্রদীপের আলোতে মন্দির সাজাবো। আমার মনে পড়ছে আমি এই কাজটা করতাম" বললাম আমি।
মাটির প্রদীপ আনা হল। সুতপা আর আমি সেগুলোতে তেল ঢেলে, পলতে বসিয়ে, আগুন জ্বেলে পুরো মন্দির সাজিয়ে দিলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যারতির সময় হয়েছে। অনেক লোক এই সময় আসে। সবাই এসে দেখলো আজ মায়ের এই আলো ঝলমলে সাজ।
আমি ব্রজেন জ্যেঠুকে বললাম "জ্যেঠু, তুমি আগে সন্ধ্যারতি কর। লোকজন চলে গেলে তারপর ঐ রহস্যময় দরজা খোলা হবে।"
"তুই ঠিক বলেছিস মা" বলে জ্যেঠু সন্ধ্যারতি শুরু করলেন। বীরুদা কাঁসর বাজালো। দ্বিজুদা মন্দিরের বিশাল ঢাক বাজাতে থাকলো। জ্যেঠিমা মুহূর্মুহূ শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। আমার জ্যেঠু তাঁর উদাত্ত কন্ঠে দুর্গা মন্ত্র স্তব করতে লাগলেন। আমি আর সুতপা হাতে হাত ধরে বসে রইলাম।

বাইরের লোকজন চলে গিয়ে মন্দির ফাঁকা হতেই দুর্গা মাকে প্রণাম করে দুরুদুরু বক্ষে আমি গিয়ে ঐ দরজার গোল হাতলটা ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। খুবই ছোট খোপ। ভেতরে একটা কাঠের বাক্স। আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। বাক্সটা বের করে এনে দুর্গা মায়ের পায়ের সামনে বসলাম। সবাই আমাকে ঘিরে বসে আছে। আমি বাক্সের ডালাটা খুললাম। ভেতরে মলমলের কাপড়ে জড়ানো আমার সেই মুগার মেখলা-চাদর। তার ওপরে রাখা একটা সোনার হার, যার লকেটে মা দুর্গার মুখ আঁকা। আমি মেখলা-চাদরে হাত

বুলোতেই ওটা ধূলো হয়ে যেতে থাকলো। একটু পরে বাক্সে পড়ে রইলো এক রাশ ধূলো, যার মধ্যে জ্বলজ্বল করতে থাকলো সেই সোনার হারটা। আমি সেটা তুলে দুর্গা মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে নিজের গলায় পরলাম। এই হার আমি কখনও গলা থেকে খুলবো না।

সবাই বিস্ময়ে নিশ্চুপ। আমি বললাম "কাল এই ধূলো বাগানের মাটিতে মিশিয়ে দেবো আমরা। এটা মায়ের আশীর্বাদ পূত মাটি। আমরা সবাই ঠাকুর দালানে এসে বসলাম গোল হয়ে। মাঝখানে রেকাবিতে রাখা প্রসাদী ফল। আমরা এক দু টুকরো তুলে মুখে দিচ্ছি। কিন্ত সবাই নিশ্চুপ। এই অন্ধকার রাত, নক্ষত্র খচিত আকাশ, প্রদীপে সজ্জিত ঠাকুর দালান, আমরা হতবাক কিছু প্রাণী আর নিঃশব্দ চরাচর- এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হল আজ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম "আহোম রাজাদের সময় কি মুগা সিল্কের চল ছিলো?"
বীরুদা বললো "হ্যাঁ, ছিল। আহোম রাজাদের রাজত্ব কালে মুগা সিল্ক খুব উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। শুধু আহোম রাজাদের সময় নয়, তার অনেক আগে থেকেই আসামে মুগার প্রচলন ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন সাং-এর বর্ণনা অনুযায়ী আহোম রাজাদের তিন চারশ বছর আগে কুমার ভাস্কর বর্মন তাঁর বন্ধু কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনকে অনক মুগা সিল্ক উপহার দিয়েছিলেন।"
বীরুদা আরও বললো "আহোম রাজাদের ইতিহাসে জানা যায় যে মুগা চাষিদের ট্যাক্স দিতে হত না। তবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সিল্ক রাজাকে দিতে হত। এই পরিমাণ নির্ধারিত হত সেই চাষির কতটা চাষের জমি আছে তার ওপর।"
দ্বিজুদা বললো "তুই এত জানলি কি করে?"
বীরুদা বলে "বা রে! আমি যে ইতিহাসের ছাত্র। জানাটাই তো স্বাভাবিক।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা, বাক্স খোলার পর যেই বাইরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে এলো অমনি মেখলা-চাদরটা ধূলো হয়ে গেল কেন? এগুলো কি bio degradable?"
বীরুদা বললো "বায়ো ডিগ্রেডেবলই তো। সবই তো প্রাকৃতিক উপাদান। প্রকৃতির জিনিস প্রকৃতিতেই মিশে যায়।"

জ্যেঠিমা বললেন "রাত একটা বেজে গেছে। এবারে সবাই ঘুমোতে যাও। কাল ভোরে সবাই স্নান করবে। বড় করে মায়ের পূজো হবে। তারপর ঐ বাক্সটা নিয়ে বাগানে গিয়ে সবাই মিলে এই ধূলো মিশিয়ে দেব বাগানের মাটিতে।"

সুতপার রুমে এসে আমরা হাতে হাত রেখে চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ।
হঠাৎ সুতপা জিজ্ঞেস করলো, "তুই আমার কে রে?বোন? না কি দিদার দিদার দিদার.....?"
আমি বললাম "এ জন্মে আমি তোর বোন। তবে আমি যে আসলে কে সেটা একটা প্রহেলিকা।"

JASHN
Celebrate India

Authentic Indian
Cafe & Restaurant

BRIYANI

Chicken Biryani

Mutton Biryani

Veg. Biryani

TANDOORI SPECIAL

Mughali, Bengali &South Indian Curries

Daal

Achari Chicken

Pepper Mutton

Bengali Fish

"Best Biryani in town | ビリヤニ専門"

6-29-8 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072

JashnTokyo 03-4360-3693 +81 80-9557-6254

Zen: The Union of Two

Ankita Sen, Jeet Biswas

Background and Experience

Japan, the land of the rising sun, had long fascinated us. Like many from our generation who grew up with Pokémon and anime, a trip here was a dream. The occasion arrived in the form of a wedding invitation from a dear friend—a union of two cultures with ancient roots. What awaited was far beyond a journey of sightseeing.

From the moment we arrived, we were struck by the quiet grace of the people. A bow—simple, humble—served as a greeting, gratitude, and farewell. In a city of millions, order reigned without force: trains glided on time, queues formed naturally, and streets remained spotless. Even the meals reflected this harmony: self-service machines, multilingual menus, steaming bowls arriving moments after we sat, as if the kitchens had anticipated our hunger.

Sculptures from Kyoto

Japan, we realized, is a society where discipline and kindness are not separate virtues, but threads of the same fabric. At Tokyo's Senso-ji temple, amid incense smoke and prayerful crowds, we met an elderly woman who embodied this spirit. Sitting quietly on a bench, she smiled and offered us her presence. With no common language, we relied on gestures and Google Translate to converse. She told us she was a Buddhist priestess, a traveler, a healer. Before parting, she returned with temple books as gifts, blessing us with words that needed no translation. In that exchange—simple, unadorned—we glimpsed what Zen truly is: the union of humility and clarity, of silence and boundless generosity.

Philosophical Root

Zen's story begins in India, with Siddhartha Gautama, the Buddha, who taught the way out of suffering in the 6th century BCE. At the same time in Japan, early Shinto practices were revering the spirits of nature, the kami. Two different streams, destined to converge. Buddhism journeyed eastward through centuries. The Indian monk Bodhidharma carried Dhyana—meditation—to China, where it became Chan. In time, Chan sailed further east, reaching Japan as Zen in the 12th century. While India gave Zen its philosophical heart—shunyata (emptiness) and anitya (impermanence)—Japan gave it aesthetic form: gardens of gravel and stone, the tea ceremony where each gesture is a meditation. The wisdom of emptiness is not a void but a fullness—an awareness that nothing stands alone, that all things rise and fall together. Like cherry blossoms, dazzling yet fleeting, life is beautiful because it does not last. Even modern quantum physics

whispers the same truth: matter itself dissolves into probabilities, with nothing fixed and everything interdependent. Walking Kyoto's ancient temples, we felt this insight come alive—spaces centuries old, yet renewed with every breath of the pilgrims who walk their paths.

The Union

Our journey culminated in Tokyo at the Meiji Jingu Shrine, where the wedding—an Indian groom and Japanese bride—was celebrated in a traditional Shinto ceremony. We had prepared for weeks: dress codes, rituals, timing. Inside the inner shrine, usually closed to the public, we were welcomed with cherry-blossom drinks before the couple appeared in their splendid attire—she in a white shiromuku, he in a black montsuki. The rituals unfolded with serene precision: offerings to the kami, the San-san-kudo rite of sharing sake in three sips, prayers, and blessings. We too sipped the sacred sake, joining our hopes with theirs. The atmosphere was both intimate and universal—a reminder that spiritual truth is not bound by geography.

Pictures from the wedding ceremony

It was more than a wedding. It was a meeting of worlds—India and Japan, Shinto and Buddhism, two lineages flowing into one. Just as Dhyana evolved into Zen, so too can cultures converge without losing their distinct identities, creating something at once ancient and new. From Bodh Gaya to Fushimi Inari, the silence remains the same. In that silence lies the essence of Zen: a union not of doctrines, but of presence, humility, and the eternal now.

সোনা রোদের গান

ড. সোমা মুখোপাধ্যায়

ঝকঝকে সোনা রোদ উঠেছে আজ। বাতাসে বেশ পুজো পুজো গন্ধ। আর কয়েক দিন পরেই স্কুলের ছুটি হয়ে যাবে। বিট্টু, টুটলি, পুতুল, লালু এই চারজনে মিলে গল্প জুড়েছে সকাল বেলায়। এমনিতে রবিবার এই চারজনেরই কিছু না কিছু ক্লাস থাকে সাঁতার, আঁকা, গান ইত্যাদি প্রভৃতি। আজ বিশ্বকর্মা পূজো বলে ছুটি আছে। ক্লাস থ্রিতে পড়ে চারমূর্তি। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। পড়ার চাপে তাদের গল্প করতে বসার সময় হয় না। তাই জমিয়ে গল্প করছে চারজন। টুটলিদের বাড়িতেই আড্ডা বসেছে আজ। তাদের মায়েরা বিভিন্ন NGO র কাজে যুক্ত। সামনে পুজো কোথায় কোথায় জামা কাপড় দেবেন সেই নিয়েই আলোচনা। মায়েদের গল্পের মধ্যে একইসঙ্গে একটু-আধটু নিন্দা মন্দ চলছে। কখনো কখনো একজন অপরজনকে হালকা করে ঠুকে দিচ্ছেন। আর তার সঙ্গে খাওয়া তো চলছেই। টুটলিদের ও আড্ডার বিষয় পুজো। কার কটা জামা হল, কোথায় বেড়াতে যাবে পুজোর ছুটিতে - এইসব নিয়েই কথা চলছে। তারা নির্ভেজাল আড্ডাই মারছে।

গল্প করতে করতে টুটলি হঠাৎ বলে উঠলো জানিস আমাদের ফ্ল্যাটের পিছনে যে বস্তিটা আছে, সেখানে আমার কতগুলো বন্ধু আছে। বাকি তিনজন প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, "এই তুই বস্তির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস, তোর মা বকে না। " টুটলি বলল, "ধুর, আমি কি ওদের সঙ্গে খেলি? ওদের একটা ছোট্ট খেলার মাঠ আছে, ওরা যখন খেলে, জানলা দিয়ে তখন সেটা দেখি আর হাততালি দিই। খেলা দেখতে দেখতে ওরাও আমাকে চিনে গেছে। আমরা ইশারায় কথা বলি। বন্ধু হয়ে গেছে ওরা। ওখানে আসলাম, আয়েশা, ইলা, সন্তু, পিন্টু এরকম কত বন্ধু আছে। ওরা কত মজার মজার খেলা খেলে জানিস! "

"কী খেলা রে!"

"সিঁদুর-টোকাটুকি, গাদন, কিত কিত- কী ভালো যে লাগে ওদের খেলাগুলো! দেখবি? চল জানলা দিয়ে দেখাই। এখন ওরা খেলছে।" চারজনে ছুটে এসে চারতলা ফ্ল্যাটের জানলার গ্রিল ধরে দাঁড়ালো।

জানলার ও পাশে অনেক নিচে একফালি ছোট মাঠ। চারদিকে নোংরা আছে গাছা জন্মেছে তার মধ্যেও সবুজ ফালিটুকু ঝকঝক করছে। আর তাতেই কিচিরমিচির করছে ১০-১২টা ছেলেমেয়ে। ময়লা ময়লা তাদের জামা কাপড় রুক্ষ-মলিন, তেলহীন, কটা কটা চুল কারো পিঠে সেপটিপিন দিয়ে কারো বুকে গিঁট মেরে জামাটা গায়ের সঙ্গে আঁটকানো। অবশ্য তাতে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, অনাবিল আনন্দে হই হই করছে সব ক'জনে।

ওদের আনন্দ দেখেই এই চারজনের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠলো - যেন ওরাও- এই দলের সঙ্গে খেলতে শুরু করলো মনে মনে. টুটলি উৎসাহ ভরে ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলো।" এটাকে গাদন খেলা বলে বুঝলি- শুরুর দিকে ওই যে পাশের ঘরটা, ওটা নুন ঘর। সব্বাইকে একবার নুন ঘরে যেতেই হবে। আর তারপর, সব ঘর ঘুরে এসে, বাইরে পা দিলেই গাদন দেওয়া যাবে।" বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল বাকি তিন জন। এদিকে টুটলি বলে চলেছে, "ওটা আসলাম, ওইটা পিন্টু, ওইটা মিনতি- দেখছিস, পিন্টু নুন ঘরটা পাহারা দিচ্ছে। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। ওই দেখ, মিনতি একেবারে শেষ ঘরে চলে গেছে। বুঝলি, পিন্টু সন্তু আর আসলাম এক দলে হয়েছে। আর অন্য দলে রয়েছে ইলা, আয়েশা আর মিনতি।"

খেলার রীতিমতো জমে উঠেছে। আর, মাঠের খেলার সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে খেলে চলেছে ফ্ল্যাটের চারজন। তারাও নিজেদের মত করে বক্তব্য পেশ করে চলেছে। দু'দল হয়ে গেছে। বিট্টু টুটলি এক দলে, পুতুল আর লালু এক দলে। পিন্টু নুন ঘরে সামনে দাঁড়িয়ে থাকাতে, পুতুল আর লালু বেজায় গজগজ করছে। ওদিকে, জোর

গলায় বিট্টু আর টুটলি সমর্থন করে চলেছে পিন্টুকে। একটা সময় দেখা গেল, মিনতি আর ইলা, পিন্টুকে টপকে নুন ঘরে ঢুকে পড়েছে। আর উল্টোদিকে, আয়েশা, ছুটে গিয়ে ঘরের বাইরে পা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ছয়জনের পাশাপাশি ঘরের চার জন ও চিৎকার করে উঠলো, "গাদন!" চার মা ছুটে এসে, কী করছিস! কী দেখছিস! এই এঁদোপচা, নোংরা বস্তির দিকে তোরা কী দেখছিস "- ইত্যাদি প্রভৃতি প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে বাচ্চা চারটে জানলা থেকে সরে এসে যেন বাঁচল। কিন্তু মনের মধ্যে তাদের লেগে থাকলো খুশির আলোর ঝলকানি।

পরদিন থেকে আবার যথারীতি স্কুল শুরু হয়েছে ওদের। চারজনের চোখে মুখে মনে লেগে আছে গাদন খেলার আনন্দ। বড্ড ইচ্ছা খেলতে, কিন্তু সঙ্গী কোথায় পাবে? তাই, গল্পতেই প্রত্যেকটি স্টেপ কাটা ছেঁড়া করে আনন্দ পায় তারা।

দিন কয়েক কেটে গেছে। পুজোর আর হপ্তা খানেক বাকি। স্কুল ছুটি হলো বলে। এমন সময় টুটলি এসে একদিন বলল," জানিস আসলামের খুব জ্বর।" শুনেই, বাকি তিনজনের মন খারাপ হয়ে গেল, যেন কত দিনের আপনজন আসলাম। পরের দিন তুতলি স্কুলে এলেই বাকি তিন জনে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল,"আসলাম কেমন আছেরে?"ভালো নেই বোধ হয়। আসলাম তো ঘর থেকে বের হয়নি, আর ওর মাকে দেখলাম সকাল বেলায় কাজে বেরিয়ে গেল। আজ বোধহয় আসলাম কেউ পাবে না রে।"

মন খারাপ নিয়ে কি ক্লাসগুলো করলো ওরা। টিফিনের সময় চারমূর্তি এক জায়গায় হয়ে বেশ খানিকক্ষণ গুজগুজ ফুসফুস করল। স্কুল ছুটির পর স্কুল বাস থেকে নেমে চারজনে হাত ধরাধরি করে চলল আসলামের বাড়িতে বাড়ির কাছেই বাস নামায় আর আসলামের বাড়ি যেতে হলে টুটলিদের বাড়ির পাশের ছোট্ট ঘিঞ্জি গলিটা দিয়ে যেতে হয়। অনায়াসে পৌঁছে গেল তারা। গিয়ে দেখল, অসুস্থ আসলাম, প্রায় অন্ধকার ঘুপচি ঘরে বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়ে আছে। ওদের দেখে কোনরকমে উঠে বসল বিছানায়। জানলার গ্রীল দিয়ে সে-ও এই চার বন্ধুকে দেখেছে। আর টুটলিকে তো চেনেই। তাই, ভালোবাসা সারল্যে মাখামাখি পরিচিতের হাসি উঠল তার মুখে বলল, "আয় তোরা বস।" ছোটদের মধ্যে বোধ হয় পরিবেশ জনিত সংকোচ থাকে না। তারা বোধ হয় সবকিছুই মন দিয়ে দেখে। তাই অনায়াসে এক বিছানায় চারজনে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ইলা আর মিনতি এসে জুটলো। চারজনে টিফিনে টিফিন খায়নি। সেই জমিয়ে রাখা টিফিন একসঙ্গে বসে ভাগ করে খেতে লাগলো। আনন্দ উপচে পড়তে লাগলো ছয় জনের চোখে মুখে। ঠিক হলো পরের দিন তারা আয়েশা আর পিন্টু কে ও ডেকে নেবে। অবধারিতভাবে পুজোর জামার প্রসঙ্গ উঠতেই থেমে গেল ইলা, মিনতি, পিন্টু - না তাদের জামা হয়নি, ওদের মা-রা যে সব বাড়িতে কাজ করে সেখান থেকে বোনাসের টাকা পেলে তবেই তাদের জামা হবে। আর মিনতির তো নতুন জামা হবেই না, দিন কয়েক আগে মিনতির বাবার জ্বর হয়েছিল। কাজের বাড়ি থেকে ধার নিয়ে মিনতির বাবার জন্য ওষুধ কিনে এনেছে মিনতির মা। পুজোর আগেই টাকা শোধ করতে হবে, তাই এবারে আর তার জামা হবে না।

পরদিন টিফিনের সময় আবার চারমূর্তিতে মিটিংয়ে বসলো। আজকে তারা তাদের জমানো টাকাগুলো সঙ্গে করে এনেছে। আর তার সঙ্গে, তাদের প্রায় নতুন কিছু জামা। স্কুল ছুটির পর, আজকেও তাদের অভিযান শুরু হলো। জামা, টাকা পয়সা সব তারা গিয়ে তুলে দিল নতুন বন্ধুদের হাতে। আজকেও তারা তাদের টিফিন এনেছে। দশজনে বসে মহানন্দে টিফিন ভাগ করে খেলেও, টাকা বা জামা নিতে রাজি হলো না তারা। সে এক

আগমনী

মহা মনকষাকষি কথা কাটাকাটি শুরু হলো দশ জনে। এই চারজন ও শুনবে না, আর বাকি ছয় জন ও কিছুতেই জামা, টাকা নেবে না। এরকম করে তর্কাতর্কিতে কখন যে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে টুটলিদের আর খেয়াল নেই। এমন সময়, আসলামদের ঘরের সামনে টুটলির মায়ের গলা পেয়ে চমকে তাকালো দশ জন। দেখলো- বিট্টু, টুটলি, পুতুল, লালুর মায়ের পাশাপাশি ওদের ছয় জনেরও মা এসে হাজির। অবধারিতভাবে মহা

ঝামেলার সৃষ্টি হবে এবার, এই ভেবে ভয়ে গেল সিঁটিয়ে গেল দশ জন। কিন্তু, না, তা তো হলো না। তাদের ভালোবাসায় আজ সবার মনেই ভালবাসার আলো। টুটলির মা বড্ড আদর করে জড়িয়ে ধরলেন আসলামকে। চার মা- ই আজ তাদের এই ছেলে মেয়ের কাজের জন্য বড্ড খুশি। ঘটা করে এনজিও খুলে তাঁরা দূরদূরান্তে সেবা করেন। কিন্তু, ঘরের পাশে এই অন্ধকারে কোনদিন দৃষ্টি পড়ে নি তাঁদের। ছেলেমেয়েগুলো যেন নিজেদের হাত ধরে অন্ধকার থেকে আলোর পথে দাঁড় করিয়েছে তাঁদের। বস্তির স্ট্রিট লাইটের টিম টিমে আলো আজ যেন ঝলমল করছে। এই মায়েরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বস্তির সব শিশু যাতে পুজোতে নতুন জামা পরতে পায়, তার ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। আগামীকাল মহালয়া। মহামায়ার আগমনীর সুর বাজছে আজ সবার মনে।

ছবি : পৌষুর্মী ঘোষ

ছবি : দেবরাজ বিশ্বাস

ছবি : আয়ুষ্মিত বিশ্বাস

ছবি : স্নেহিত মুখার্জী

ওবাআচান

অনুরাগ ঘোষ

২০২২ এর শেষে কিংবা ২০২৩ এর শুরুর দিকে একদিন জাপানে আমার সাগামিহারার ফ্ল্যাটে বসে খুব মন দিয়ে পড়াশোনা করছিলাম। হঠাৎ করে শুনলাম বেল বেজে উঠলো। আমি বেরিয়ে দেখলাম, এক জন মাঝবয়সী জাপানি মহিলা এবং একজন বৃদ্ধা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় ৫০-এর কাছাকাছি বয়সী মহিলা আমার দিকে একটি গিফট ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে জাপানিতে বললেন,
"আমরা পাশের ফ্ল্যাটে এসেছি। তাই 'ওমিয়াগে' (souvenir/স্মারক) হিসেবে এটা রাখবেন।"

আমি হাসিমুখে উপহারটি গ্রহণ করলাম। তখনও জানতাম না, এটি হবে একটি সুন্দর সম্পর্কের সূচনা।

ছবি : পৌষুর্মী ঘোষ

ওদের দেওয়া জাপানি মিষ্টি ('ওকাসি') বেশ ভালো ছিল। কিছুদিন পর ধন্যবাদ জানাতে আমি আবার কিছু জাপানি খাবার নিয়ে পাশের ফ্ল্যাটের বেল টিপলাম। দরজা খুললেন সেই ঠাকুমা। আমি বললাম, "এই পাড়ায় আপনি নতুন তো, তাই কিছু সাহায্য লাগলে আমাকে বলতে পারেন।" তখন জানতে পারলাম উনি ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকেন। মেয়েটি, যাকে আমি প্রথমবার দেখেছিলাম, তিনি ওনার মেয়ে–কিছু স্টেশন দূরে থাকেন। আর ছেলেও কাছাকাছি থাকেন।

ওনার বয়স ৮১ বছর, তবুও একা একা বাজার করেন, রান্না করেন, এত বড় ফ্ল্যাটে একাই থাকেন–এই ভেবেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওইদিন ওনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। এত মিষ্টি ভাষা, সরল স্বভাব, দয়ালু মুখশ্রী–সব মিলিয়ে এক অসাধারণ মানুষ মনে হলো। আর এমনিতেই আমার বয়স্ক মানুষদের প্রতি টান আছে। তাঁদের দীর্ঘ জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু শেখা যায় বলে আমি মনে করি।

এরপর থেকে প্রায় প্রতি শনিবার কিংবা রবিবার আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের দালানে ওনার সঙ্গে দেখা করতাম। আমি তাঁকে 'ওবাআচান' বা জাপানিতে ঠাকুমা বলি । উনি খুব পুরোনো দিনের জাপানি ভাষা ব্যবহার করেন, তাই সব কথা বুঝতে পারতাম না। আমি অবসর সময়ে জাপানি ভাষা নিয়ে চর্চা করি এটা তিনি জানেন, তাই প্রায়শই বলতেন, "এই কথাটা মোবাইলে লিখে নাও, পরে অভিধানে দেখে নিও।" একদিন তিনি আমাকে একটি জাপানি শেখার বইও দিয়েছিলেন।

এত বছর বয়স, তবুও তিনি পৃথিবীর সব খবর রাখেন। বলেন, এখন পড়তে কষ্ট হয়, তাই 'ইউটিউব'-এ খবর শোনেন। জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা, ইসরায়েল–ইরানের যুদ্ধ, গাড়ির কোম্পানি নিসানের লোকসান–সব খবরই তাঁর জানা। আমি যতই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, ততই অবাক হয়েছি। বলতে দ্বিধা নেই, আমার জাপানি ভাষার শব্দভাণ্ডার বিকাশ ও আত্মস্থ করার পেছনে তাঁর বড় অবদান আছে।

প্রত্যেক নতুন বছরে তিনি নিজে হাতে আমাকে জাপানি নববর্ষের ঐতিহ্যবাহী খাবার 'ওসেচি রিওরি' (おせち料理 / Osechi Ryōri) বানিয়ে দিতেন। উনি জানতেন আমি গরু বা শুয়োরের মাংস খাই না, তাই বেছে বেছে আমার খাওয়ার উপযোগী রান্নাই করতেন। আমি ভারতে ছুটিতে গেলে মা–বাবার জন্য তিনি নানা জাপানি খাবার পাঠাতেন, আর আমি তাঁর জন্য নিয়ে যেতাম খেজুর ও বাংলার মিষ্টি।

'ওসেচি রিওরি' (おせち料理 / Osechi Ryōri)

অনেক সময় কর্মক্ষেত্র বা অন্য কোনো কারণে সমস্যা বা দুশ্চিন্তা হলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম। তাঁর কথা শুনে সবসময় মন ভালো হয়ে যেত। জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তিনি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন আজকের দিনটা দেখার জন্য। তিনি বলতেন, জীবনের সমস্যাকে নেতিবাচকভাবে না নিয়ে অতিক্রম করার মধ্যেই প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। তিনি আরও বলতেন, সবসময় শুধু কাজ বা পড়াশোনা করলে পৃথিবীটা বদ্ধ মনে হতে পারে। তাই মাঝেমধ্যে বিনোদনের জন্য সময় বের করা উচিত। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা বা নতুন কোনো জায়গা ঘুরে আসা থেকেও অভিনব চিন্তার জন্ম হয়।

জীবনের ছোট ছোট জিনিসের মধ্যেই তিনি আনন্দ খুঁজে পান–সূর্যোদয়ের সময় আকাশের সুন্দর রং, বাড়ির পাশে ঘাসের মধ্যে ফুটে থাকা ছোট ছোট ফুল, আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘমালা।

প্রতি বছর তিনি আমার জন্মদিন মনে রাখতেন। অফিস থেকে ফিরে দরজায় ঝোলানো উপহার ও একটি কার্ড পেতাম। এত বয়সেও কীভাবে এত নিখুঁতভাবে আমার জন্মদিন মনে রাখেন, তা ভেবে সবসময় অবাক হই।

চাকরিসূত্রে যখন আমি সাগামিহারা থেকে ইয়োকোহামায় স্থানান্তরিত হচ্ছিলাম, তিনি একটু দুঃখ পেলেও বললেন–"'লাইন'-এ (জাপানের মোবাইল মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন) তো কথাবার্তা হবেই।" আরও বললেন, "এই আড়াই বছর তোমাকে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার কৌতূহল অনেক বেড়ে গেছে।" আমি মনে মনে স্থির করলাম, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব এবং নিয়মিত চিঠি লিখব।

যদি আমরা আমাদের জীবনের দিকে ফিরে তাকাই, তবে নিশ্চয়ই এমন কিছু মানুষকে খুঁজে পাব, যারা অল্প সময়ের জন্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিলেন, কিন্তু তাঁদের স্নেহ, শিক্ষা আর ছোঁয়া আজও অমলিন। আমার 'ওবাআচান'-এর মতোই আপনার জীবনে কে সেই মানুষ, যিনি অল্প সময় থেকেও চিরকালীন প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন?

Celebrating Five Glorious Years of Durga Puja with ICCHE

Krishnendu Laha

For the past five years, ICCHE (Indian Club for Culture, Heritage & Entertainment) has been the heartbeat of the Bengali and Indian community in the Rhein-Ruhr region (Duesseldorf, Cologne, Dortmund, Essen etc.) of Germany, uniting hundreds of families through the vibrant celebrationof Durga Puja. What began as a heartfelt initiative rooted in devotion and nostalgia has nowgrown into a cultural phenomenon, filled with joy, rhythm, color, and togetherness.

At the heart of our celebration lies the powerful presence of Maa Durga. From the serene rituals of Kalabou Snan and Pushpanjali to the soulful chanting of mantras, each puja is performed with precision, devotion, and reverence. The rituals are complemented by the energetic beats of dhak, the fragrance of incense, and prayer - creating a truly divine ambiance.

Over these years, ICCHE has brought together people from diverse regions and cultures, blending traditions from Bengal, Gujarat, Maharashtra, Odisha, and more. Garba night adds rhythmic sparkle to the celebrations, while Sindur Khela and Vijaya Dashami bring out deep emotion, marking farewells with red vermillion smiles and tearful joy. A defining feature of our Puja is its integration of art, music, and dance. Classical, folk, and Bollywood performances have lit up the stage, with contributions from local talents and professionals alike. From soulful Rabindra Sangeet to electrifying band performances, every evening turns into a cultural festival of its own. Children and youth are not just participants but co-creators — through drama, fashion shows, musical plays, and even editorial work in our magazine “Icchedana”. Most importantly, ICCHE’s Durga Puja has become a platform for inclusion. People of all nationalities and beliefs have walked in to experience the spirit of Shakti, to taste festive food, and to join in dances, creating moments that go beyond language and borders. We look ahead with hope, devotion, and the same passion that lit our very first lamp. ICCHE welcomes the world to be a part of this celebration — where tradition meets creativity, and every heart finds a home.

Haiku (俳句)

পূজোর পাঁচ

1.
ষষ্ঠী তো এলো
পড়াশুনা, কাজ রেখে
প্যান্ডেলে চলো !

2.
সপ্তমী নাকি?
মুদিয়ালী, নাকতলা,
পুরো নর্থ বাকি !

3.
অষ্টমী ভোরে
স্নান সেরে পুজো দেবো
হাতে হাত ধরে।

4.
নবমীর রাতে
কচি পাঁঠা ,সাদা ভাত
জেলুসিল সাথে

5.
দশমীর ঢাকে
পার্বতী ঘরে ফেরে
এক মেয়ে থাকে

~ *Biplab*

葦ゆらり(ヨシゆらり)
秋の風景(あきのふうけい)
十日祭(とおかさい)
~Sayantani Das

কাশফুল ডাকে
'আগমনী' সুর ভাসে দূরে
পুজো আসছে।

~ *Sudeshna*

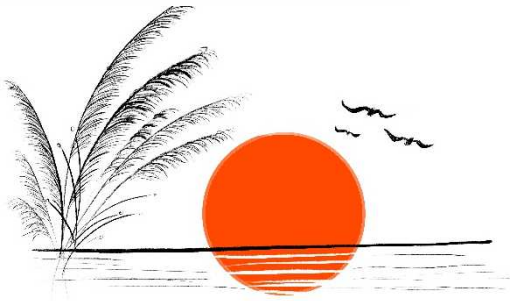

Chaichai~TaiTai
তাইরে নাইরে নাই
遊びたい！旅行したい！楽したい！
এখুনি ！一緒に！
———

Taire Naire Nai,
Asboitai,Ryokoushitai, Tanoshitai
Ekhuni, Ishooni.

~ *Durjay*

The sky held its breath,
As India crossed the line
Not of land, but time.

~ *Antara*

I long for my home
Twilight, laughter and music
Faraway here, I'm Home.

~ *Sukanya*

Luz va,
risas en la plaza,
sol.

Light
Laughter in the square
And sun
~ *Antara*

কৈশোরের দুপুর
বন্ধু, বটতলা, ক্রিকেট
ফিকে কোলাহল

~ *Subhasis*

While Rabindranath dreams,
Nazrul rages like the sea,
Bengal speaks through them.

~ *Antara*

Adda at dusk,
Carrom under dim street lights
Time forgets to move.

~ *Antara*

আজ আবার বৃষ্টি
কলেজের ক্যান্টিন একরাশ অপেক্ষা
বৃষ্টি কি কাঁদায় ?

~ *Sugam*

Saptaparni's shade,
Gurudev's thoughts still echo,
Seeds of knowledge grow.

~ *Somdutta*

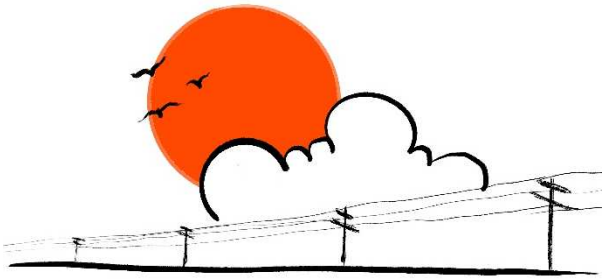

बारिश के बाद
धरती तभी तो महकेगी
जब कई बूँदें गिरेंगी !

~ *Nitin*

মনের কোনো এক গোপন কোণায়
আমি আর তুমি আছি আমার মতন করে
সে না জানা থাক্ সবার॥

~ *Tanaya*

শিউলি কাশে দোল
ঢাকেতে সেই চেনা বোল
প্রবাস ব্যথা ভোল।

~ *Kaustav*

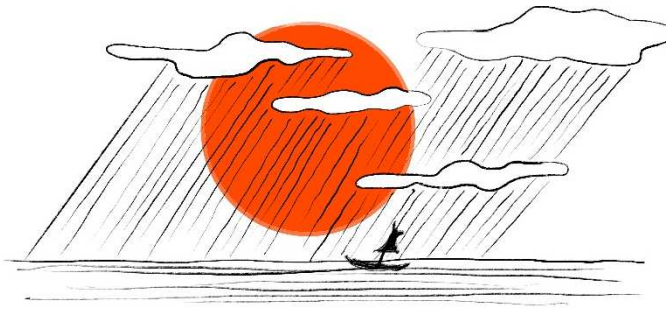

Home away from home
Music brings us together
Joy unlimited

~*Supriyo*

ব্রহ্ম মুহূর্তে পিতার মৃত আত্মার দর্শন এবং ব্রহ্ম মুহূর্তের কার্যকারীতা

পার্থপ্রতিম ব্যানার্জী

হঠাৎ আমার পিতা অর্থাৎ বাবা যাকে আমি বাপি বলে ছোটোবেলা থেকে ডেকে এসেছি, তিনি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করলেন আর বাপির এই অকস্মাৎ মৃত্যুতে বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। যেন এই পরিস্থিতির জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বাপি খুব সৎ, ন্যায়পরায়ণ আর সত্যনিষ্ঠ ব্যাক্তি ছিলেন। কোনোদিন কাউকে মিথ্যা কথা বলা বা ঠকানো এসব দেখিনি। ঠাকুর দেবতা মানতেন, কিন্তু কখনই আড়ম্বর করে পূজাপাঠ করতে দেখিনি। এমনকি দুর্গা পূজা বা সরস্বতী পূজার অঞ্জলী দিতেও দেখিনি। বাপির মুখে শুনেছি বাপিদের দেশের বাড়িতে খুব জাঁকজমক করে দুর্গাপূজো হতো, বহু লোকের সমাগম ঘটত, যজমানদের থেকে পাঁঠাবলীর বহু সংখ্যক পাঁঠা আসতো। এরকম একটা সাত্বিক পরিবারের সাত্বিক ব্যাক্তি হওয়া সত্বেও কোনোদিন নিজে পূজো করতেন না বা কোনো পূজো হোম যজ্ঞে অংশ নিতেন না। তবে বাপি নাস্তিকও একেবারেই ছিলেন না। ছোটবেলা থেকে দেখেছি দুর্গা পুজোর সময় আমাদের প্রত্যেকদিন নিয়ম করে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতেন, প্যান্ডেলের মধ্যে ঠাকুরের মূর্তির সামনে খুব দ্রুত হাতটা একবার মাথায় ঠেকিয়ে নিতেন। বাপি কালীঘাটে, দক্ষিণেশ্বরে বা আদ্যাপীঠে যেতে খুব পছন্দ করতেন। কালীপুজোর দিন বিকেল থাকতেই মোমবাতি নিয়ে ছাদে গিয়ে সারা ছাদের কিনারা বরাবর মোমবাতি বসাতে শুরু করতেন। এব্যাপারে ছোটবেলায় আমাকে ডেকে নিয়ে যেতেন ও আমার সাহায্য নিতেন। ছোটবেলায় আমাকে আমার দিদিদের মা ও শিখাপিসিমনিকে নিয়ে কালীপুজোর দিন রাত্রে খাওয়াদাওয়া পর পর্ণশ্রী ও সংলগ্ন অঞ্চলের ঠাকুর দেখিয়ে মাঝরাত্রে আমাদের নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। ততক্ষণে শুরু হয়ে যেতো সব প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে কালীপুজোর পূজাপাঠ ও যাগযজ্ঞ। এর থেকে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হয়ে যায় বাপি ছিলেন কালী ঠাকুরের খুব ভক্ত। কোনোদিন প্রকাশ না করলেও এটা বারংবার আভাস পেয়েছি।

যাইহোক বাপির আকস্মিক মৃত্যুতে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েছিলাম। একটা সুস্থ সবল লোক দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন, বাজার দোকান ব্যাংক সব কাজে সারাটা দিন অতিবাহিত করছিলেন আর মায়ের খেয়াল রাখছিলেন ! এরকম একটি জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ করে চলে যাওয়াতে নিজেকে একেবারেই অসহায় অনুভূত হতে লাগলো। যেন সামগ্রিক পরিস্থিতিটা মনে হলো সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমি কলকাতার বাইরে থাকি তাই আমি কোনোভাবে বাপির মৃত্যু দিনটাতে লিপ্ত থাকতে পারিনি।

৭ মার্চ বাপির মৃত্যুর পর বিভিন্ন কাজে এতোটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে সামগ্রিক ঘটনাবলীর সুষ্ঠ পর্যালোচনা করারই সময় বের করতে পারছিলাম না। কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করছিল বাপির মৃত্যুর আগে বাপির সাথে বিশেষ কথা বলা হলো না। আবার মৃত্যুর পরে শুধু মাত্র দেহের দর্শন পেলেও অনেক দিন কেটে গেল বাপি দর্শন দিলেন না। তবুও মনের মধ্যে আশা ছিল বাপি আমাকে কোনো দিন দেখা দেবেন, অবশ্যই দেখা দেবেন ! এমনই শুভ ঘটনাটা যে এতটা শুভ মুহূর্তে ঘটে যাবে সেটা যেন ছিল আমার কল্পনারও অতীত। হ্যাঁ, বাপি দেখা দিলেন এক ব্রহ্ম মুহূর্তে। এতে বাপির নিখাদ সত্বিকতা দৃঢ় ভাবে আরও একবার প্রদর্শিত হলো !

দিনটা ছিল ১লা মে, শ্রমিক দিবস। এদিন ছুটির দিন হওয়ায় ভেবেছিলাম একটু দেরীতে উঠবো, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেলো এবং উঠে সব কাজ ফেলে কিছু বিশেষ ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করার জন্য আমার ডায়রীর পাতা খুলে বসে পড়লাম।

আগমনী

দিনটা ছিল ১লা মে ২০২৫ বৃহস্পতিবার মে দিবস। অনেকদিন পর আবার ডায়েরি লিখতে বসলাম। এর মধ্যে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। গঙ্গা নদী দিয়ে বহে গেছে অনেক জল। যেন দৈনিক ডায়েরী লিখন নয়, বরং বলা যেতে পারে স্মৃতিচারণ!

শেষবার ডায়েরী লিখেছিলাম ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪, অর্থাৎ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল পেরিয়ে পদার্পণ করেছি মে মাসে। বহুবার ডায়েরী লেখার জন্য পরিকল্পনা করেছি, প্রচেষ্টা চালিয়েছি, কিন্তু কেনো জানিনা, কিছুতেই যেন মনে বসছিল না, হাত ও মনের সংযোগ ঘটছিল না। আর এদিনই বা কিভাবে আমার হঠাৎ ইচ্ছা শক্তির বিকাশ ঘটলো সেটা কতগুলো বিশেষ দিনের বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ করার পর প্রকাশ করছি।

আমি অনলাইন BITS পিলানি থেকে এমবিএ করছিলাম। এর মধ্যে আমি MBA পাশ করে ডিগ্রী লাভ করলাম, আমার বড়ো কন্যা ফুলঝুরি তৃতীয় সেমিস্টার পাশ করে চতুর্থ সেমিস্টারে ক্লাস শুরু করলো, সদ্য টাটা ছেড়ে SAIL এ জয়েন করা টাটার সহকর্মী অর্ণব বোসের বিয়ে হলো, পাড়ার মেয়ে বনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলো। এর সাথে সব থেকে দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক ঘটনা হলো বাপি অর্থাৎ আমার পিতৃদেব (বাবা) ইহোলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করলেন।
হ্যাঁ, ৩ মার্চ বনির বিয়েতে খেয়ে এলেন, আর ৭ মার্চ সজ্ঞানে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন !
ইদানিং বাপি বার্ধক্যজনিত কারণে বেশি সময় ধরে কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়ে কাটাতে পারতেন না। তবুও সব জায়গায় অ্যাটেন্ড করতেন, তবে আগের মতো শরীর পারমিট করে না। তাই ৩ তারিখেও নাতনির অর্থাৎ ফুলঝুরির পেড়াপেড়িতে রিকশা করে বনির বিবাহ অনুষ্ঠানে যান ও পাড়ার ছেলে রীভুর মোটর সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরেন।
৭ তারিখেও সকালে বাজার করেন, ব্যাংকে যান ও নিজ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে বুকে ব্যাথা ব্যাথা করতে থাকে, বমি পায়, অক্সিজেনের অভাব অনুভব করতে থাকেন। মা প্রথমে গ্যাস অম্বলের জন্য হচ্ছে ভেবে ও বাপিও ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক রকম দেখাতে থাকলে ওনারা কাউকে না বললেও যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায় তখন মায়ের সাথে ফোনে থাকা ছোড়দিভাই আমাদের পাড়ার বউদিদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ প্রতিবেশীরা নিকটবর্তী বিদ্যাসাগর হাসপাতালে বাপিকে নিয়ে যান। সেখানে যাবার সময়ও নিজের পায়ে হেঁটে সিড়ি দিয়ে দোতলা থেকে নেমে , অটো রিকশায় চেপে হাসপাতালে পৌঁছান, নিজের নাম ঠিকানা বলে হাসপাতালে ভর্তি হন, সেখানে ওষুধ দেবার পর তেমন ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না সেটাও নিজের মুখে প্রকাশ করেন, তারপর হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পরাস্ত হন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
আমি ধানবাদে সপরিবারে থাকি। এতসব ঘটনা আমার ছিল অজানা, কারণ বাপি মা দুজনেই আমাকে কিছু বলেননি। এমনকি বিকেলের একটু আগে শিবানী যখন বাড়িতে ফোন করেছিল তখন ওনারা আমাকে কিছু জানাতে বরণ করেছিলেন, কারণ আমি অফিসে আছি , তাই চিন্তা করতে পারি, এই ভেবে ! এর থেকে ওনাদের মনের উদারতা উদ্ভাসিত হয়!
তাই বাপির মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকতে পারিনি। মা ওনার সঙ্গে ছিলেন । ফুলঝুরি কলেজে ছিল। পাশের বাড়ির কাকিমা কৃষ্ণা তার স্বভাববশতঃ শোনামাত্রই সোজা পিজি হাসপাতালে ওনার রোগশয্যায় শায়িতা বোনের সারাদিনের পরিচর্যার কাজ থেকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে উপস্থিত হলেন এবং বাপি শেষ জলটা ওনার হাত থেকেই খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

আগমনী

আমি খবর পাই ৯ টা বাজার কয়ের মিনিট আগে। ভাইদাদা অর্থাৎ ছোটো জামাইবাবু ফোন করে হাসপাতালে ভর্তির খবরটা জানাতেই আমি ল্যাপটপ খুলে বসে যাই এবং ট্রেনের টিকিট না পেয়ে রাত্রিকালীন বাসের টিকিট অনলাইনে বুক করা শুরু করি এবং আমার, শিবানীর আর ছোটো কন্যা সাইনার টিকিট বুক করে ফেলতে সক্ষম হই। শিবানী স্পিকার মোডে ফোন কথা বলতে থাকে। আমরা বাপির মৃত্যুক্ষণটা সামগ্রিকভাবে আনুপূর্বিক ফোনের মাধ্যমে বুঝতে পারি। অর্থাৎ বাপি চলে গেলেন!

সারা রাত ট্রাভেল করে পরেরদিন সকালে কলকাতায় বাড়ি পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়লাম । বাপির শবদেহ সৎকার করলাম। তারপর তো একের পর এক নিয়ম পালন করে চললাম। ১০ দিন পর ক্ষৌরকর্ম করে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সেরে, লোকজন খাইয়ে, নিয়মভঙ্গ পালন করে, আবার কাজে যোগ দিলাম ।

তারপরেও কেটে গেছে বেশ কিছু দিন। আমাদের কোম্পানীর ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজেশন (এফজিডি) প্রজেক্ট এর ফ্লু গ্যাস চার্জিং করে আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হলাম ৫ এপ্রিল। যথারীতি এইচ আর বিভাগের সামগ্রিক প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হবার পর ৩০ এপ্রিল ফল প্রকাশিত হল পিএমএস বা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের। এর ফলাফলের ভেতর বেশী না ঢুকে এইটুকু বলা যেতে পারে দিনটা ছিল রবিবার ছুটির দিন। সারাদিন বিশেষ কাজ ছিলনা। তাই প্রায় সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে, ঘুমিয়ে অনেকটাই শক্তি সঞ্চয় করলাম আর রাত ৪:০০ টে অবধি জাগলাম বা জাগতে সক্ষম হলাম। শুধু অফিসে না গিয়ে সারাদিন বাড়ীতে বসে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য এবং দীর্ঘক্ষণ ঘুমিয়ে শরীরকে তরতাজা করে তোলার জন্য এটা সম্ভব হলো। রাত অবধি ল্যাপটপে নানান কাজ করে ঘুমোলাম প্রায় ৪:০০ টের পর (৪:০৮), এবং একটা অকল্পনীয় স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙলো ভোর ৫:১৩ তে।

এদিন স্বপ্নে বাপি দেখা দিলেন। স্বপ্নটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির ! মানে স্বপ্নে দেখলাম বাপি মারা যাবার পর আত্মারূপে এসে দেখা দিচ্ছেন।

কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করি ! আমি দেখছি, আমি আমার কোম্পানীর রিপোর্টিং বসকে বলে দ্বিসাপ্তাহিক অন্তর কলকাতার বাড়ি যাবার কথা জানিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি! এরপর কলকাতার বেহালার বাড়িতেই বসে আছি, সেটাও একতলায়! এই দুটো একসাথে কীকরে সম্ভব হলো জানিনা, এটা বোধহয় স্বপ্নেই সম্ভব হয়, তাই ওই বিতর্কে যাচ্ছি না! যাইহোক, রাঙ্গাদি বোধহয় এসেছিলেন, বাপের বাড়ি ফিরবেন, বাক্সে জামাকাপড় গোছাচ্ছিলেন।

মা কোনও এক নাতনীকে নিয়ে খেলার ছলে ব্যস্ত আছেন। কোন নাতনী সেটা পরিষ্কার মনে পড়ছে না, বিশেষতঃ ওকে যেন পেছন থেকে দেখা গেছে। এমন সময় বাপির শোয়ার ঘরের বড় দেয়াল আয়নার নিচে, হঠাৎ কখন বাপির আবির্ভাব আমরা কেউই প্রথমে লক্ষ্য করিনি ! বাপি ওই চেয়ারে বসে মায়ের কীর্তিকলাপ দেখে ওনার সাবলীল স্বভাবসুলভ ব্যাঙ্গাত্মক হাসির সাথে সাথে কোনও রসিকতামূলক উক্তি মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আমি তখন চোখ তুলে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম বাপি এসেছেন। বাপি কি সত্যিই এসেছেন !? বাপি কি বেঁচে আছেন !? আমি গায়ে, হাতে, মুখে হাত দিয়ে অনুভব করতে লাগলাম, শরীরটা গরমই আছে। আমি বললাম, "তুমি এসেছ !? কি ভালো যে লাগছে!"

বাপি একটু মুচকি হাসলেন। এরপর বাপি ওই ঘরের দরজা দিয়ে করিডোরে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে করিডোর ও দালান অতিক্রম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। পরনে লুঙ্গী আর হাফ হাতা সাদা গেঞ্জী। বাড়িতে এই পোশাকেই থাকতেন ! আমিও বাপির পেছন পেছন উঠতে লাগলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কোথায় থাকো !? "

বাপি সরাসরি না বলে একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "চল আজ রাত্রে তোকে নিয়ে যাবো।"

-- কোথায়!?

-- কালীমন্দিরে !

-- আচ্ছা!

ততক্ষণে আমরা ছাদে উঠে পড়েছি। দেখলাম বাপি ছাদের থেকে কিছুটা এগিয়ে নিমগাছের কিছু বেড়ে যাওয়া ডাল কাটারি দিয়ে ছাঁটতে লাগলেন। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। তারপর যেনো শূন্যের মধ্যেই হেঁটে চলতে লাগলেন ! তারপর ডানদিকে ঘুরে সামনের বীরেন বাবুদের বাড়ীর সামনের ফাঁকা জমিতে নেমে হেঁটে আমাদের উঠোনের পার্টিশান দেওয়ালের দিকে হেঁটে আসছেন !

ইতিমধ্যে মাও কখন চলে এসেছেন এবং আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়াল করিনি ! আমরা দুজনে ছাদে দাঁড়িয়ে ! মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাপিকে দেখতে পাচ্ছো !?"

মা ঘাড় নেড়ে খুব সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ!"

আমি বললাম, " দেখো, বাপি আমাদের দুজনকে দেখা দিলেন !"

মা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন আর ঘাড়টা নীরবে কয়েকবার নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন! মাও বোধহয় হতচকিত হয়ে পড়েছেন !

বাপি হাঁটতে হাঁটতে প্রতিবেশী বীরেন বাবুদের জমি থেকে আমাদের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে আসছেন ! তারপর আর দেখতে পেলাম না , মিলিয়ে গেলেন, আমার ঘুম ভেঙে গেল।

মাথার বালিশের পাশে রাখা মোবাইলটা তুলে দেখলাম, তখন ঘড়িতে সকাল ৫:১৩ বাজে। বুঝলাম ব্রহ্মমুহূর্তের এই সংখ্যাটা একটা বিশেষ বার্তা বহন করছে ! বাপি চলে যাবার পর পরিবারে আমরা এখন ৫ জন হয়ে গেছি আর ১৩ সংখ্যাটা বাপি ও মায়ের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা ! তাই এই সময়টারও বোধহয় একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে!

ব্রহ্মমুহূর্তে বাপির এই বহু প্রতীক্ষিত দর্শন প্রাপ্তি আমার শরীর ও মনে একটা বিশেষ শক্তি প্রদান করলো। ঘুম থেকে উঠে মুখে একটা প্রশান্ত স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠলো । মনে হতে লাগলো যেন আমি কোনো পবিত্র দীঘির জলে সদ্য স্নান করে উঠলাম! তাই এবার আমি ব্রহ্মমুহূর্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করার সুযোগকে কাজে লাগাতে চাই।

ব্রহ্ম মুহূর্ত হল সূর্যোদয়ের আগে একটি বিশেষ সময় যা হিন্দু ধর্মানুসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ, এটি সূর্যোদয়ের প্রায় ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট আগে শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের ৪৮ মিনিট আগে শেষ হয়। এটিকে রাতের শেষ প্রহর বা মুহূর্ত হিসাবে ধরা হয়।

ব্রহ্ম মুহূর্তের সময়কাল:
সূর্যোদয়ের প্রায় ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট আগে এই মুহূর্তটি শুরু হয়। এটি সাধারণত ভোর ৩:৩০ থেকে ৫:০০ টার মধ্যে হয়ে থাকে, যা সূর্যোদয়ের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। ব্রহ্ম মুহূর্তটি সূর্যোদয়ের ৪৮ মিনিট আগে শেষ হয়।

ব্রহ্ম মুহূর্তের তাৎপর্য:
হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই সময়টিকে ঈশ্বরের উপাসনা, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন।
বিশ্বাস করা হয় যে এই সময়ে প্রকৃতি শান্ত ও নির্মল থাকে, যা মনকে একাগ্র ও শান্ত করতে সহায়ক।
ব্রহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, কর্মক্ষমতা বাড়ে এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।
এছাড়াও, এই সময়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা, করুণা ও দয়া প্রার্থনা করা হয়।

একটু বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, এই ব্রহ্মমুহূর্তে আমাদের কি করা উচিৎ।

আমরা সবাই চাই জীবনের উন্নতি ও সাফল্য। কিন্তু সাফল্য পাওয়া অতটা সহজ নয় - কঠিন , তবে অসম্ভবও নয়! তাই আমরা সচরাচর বুঝতে পারিনা ঠিক কিভাবে কোন পথে হাঁটলে সাফল্য আসবে। তাই আমরা অনেক কিছু করেও যেনো আমাদের লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হই! তাই জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময় এবং দিনক্ষণ। তাই আমি এই ব্রহ্মমুহূর্তে আমাদের কিছু কর্তব্যের কথা পাঠকবর্গের কাছে বিবৃত করতে চাই।
প্রথমতঃ, মন ও শরীরকে শক্তিশালী করার উপায় -
১) আত্মশুদ্ধি ও ইতিবাচক শক্তি - ব্রহ্মমুহূর্তে জাগার সাথে সাথে আমাদের হালকা গরম জল পান করা উচিৎ। স্নান করার আগে শরীরকে তিলের তেল দিয়ে মালিশ করা উচিৎ। এটি শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে। স্নানের পর সূর্যদেবকে জল অর্পণ করা প্রয়োজন। এটি আমাদের মনে ইতিবাচকতা বাড়ায়।
২) ধ্যান এবং প্রাণায়াম করা - গভীর ধ্যান এবং শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা। ১০-১৫ মিনিট আমাদের গভীর শ্বাস নেওয়া উচিৎ এবং তার সাথে ধ্যান করা প্রয়োজন। এটি শরীর ও মনকে ভারসাম্য প্রদান করে। "ওঁ" মন্ত্র জব করা অত্যাবশ্যক। এটি ভাইব্রেশন বাড়িয়ে শরীরকে উদ্দীপ্ত করে। যারা সকালে ধ্যান করেন তাঁদের আত্মা শান্ত থাকে এবং চিন্তা শক্তিশালী হয়।
৩) সংকল্পশক্তি এবং ভিজুয়ালাইজেশন - শক্তিশালী অভিপ্রায় এবং মনে মনে ইতিবাচক কল্পনা করা। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ব্যক্তিরা দিনের শুরু ভিজ্যুয়ালাইজেসান দিয়ে করেন। এতে চোখগুলি বন্ধ করে জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষের কল্পনা করা উচিৎ। আমি শক্তিশালী, আমি সফল, আমার জীবনের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয় - এই ধরনের অ্যাফারমেশনের পুনরাবৃত্তি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো মহান ব্যক্তির সফলতাকে অনুভব করে নিজেকে সেই অবস্থায় দেখা উচিৎ । আমাদের অবচেতন মনে সেটাই তৈরী হয় যেটা আমার তাকে বার বার দেখাই।
৪) জ্ঞান অর্জন এবং আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠ - যদি প্রতিদিন আমরা সকালে কিছু নতুন শিখি তাহলে আমাদের বুদ্ধি ও উপলব্ধি তীব্র হয়। গীতা উপনিষদ পুরান বা আমাদের ইচ্ছামতো ধার্মিক বইগুলি নিয়মিত পড়া উচিৎ। সফল ব্যক্তিদের জীবনী অথবা প্রেরনামূলক বই পড়া যেতে পারে। ধ্যানের আগে ৫ মিনিট কিছু অনুপ্রেরণামূলক শোনাও যেতে পারে। ব্রহ্মমুহূর্তে জ্ঞান গ্রহনের শক্তি ৫ গুণ বেশি হয়। আমাদের প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা উচিৎ।

৫) কর্ম ও নিজের জীবনকে পর্যালোচনা - আত্মপর্যালোচনা করা এবং কর্ম সংশোধন করা। আমাদের গতদিনের কর্মের উপর ভাবা উচিত। মনে করা উচিত আমরা কি কারও মনে কষ্ট দিয়েছি !? আমরা কি কিছু ভালো করেছি !? আজকের জন্য ৩ টি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঠিক করা যেতে পারে। আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য একটা ছোট্টো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যে ব্যক্তি দিনের শুরু আত্মপর্যালোচনা দিয়ে শুরু করে, সে দ্রুত এগিয়ে যায়।

আমার জীবনে বাপিকে দেখেছি সৎ,স্বাভাবিক, সচ্চরিত্র, সরল, সাধাসিধা জীবন যাপন করতে। বাপি ছিলেন আমার জীবনের আদর্শ। উপরোল্লিখিত কোনো নিয়ম কানুন না মেনেও কেবলমাত্র শৃঙ্খলাপরায়ন জীবন যাপন করে এবং নিয়মানুবর্তিতা পালন করে একজন মানুষ কিভাবে জিরো থেকে হিরো হয়ে উঠতে পারে বাপি হলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই ব্যক্তিত্বটির কোনোদিন কোনো ব্যাপারে লোভ, আসক্তি, অতিউচ্ছাস দেখানো, কোনো দিন মিথ্যা প্রহসন দিয়ে কাউকে প্রতারণা করা, কোনোদিন লোক ঠকানো, রসিকতা ছাড়া কোনোদিন কোনো মিথ্যাচারিতা করা বা কারও মন রেখে কথা বলে সাময়িক সন্তুষ্টিকরণ করা এর কোনোটাই কখনও ওনার মধ্যে প্রতিভাত হয়নি।

তবে আমি নিজে বাপিকে বহুক্ষেত্রে অনুকরণ করে চললেও আমি হলাম একজন কট্টর হিন্দু স্বাস্তিক চরিত্র। দেবদেবী আমি সর্বদাই মেনে চলেছি, আমি স্বামী বিবেকানন্দের পরম ভক্ত, এমন কোনো বই বা ম্যাগাজিন বা আর্টিকেল নেই যেটা স্বামী বিবেকানন্দ বা রামকৃষ্ণদেব বা সারাদামা বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নিয়ে লেখা অথচ আমি হাতের কাছে পেয়েও না পড়ে এড়িয়ে গেছি। ব্রহ্মমুহূর্তে আমাদের করণীয় উপরোল্লিখিত কার্যকলাপ আমি অল্পবিস্তর ফলো করারও চেষ্টা করেছি। কত শতাংশ করতে পেরেছি সেটা বলাই বাহুল্য!

তাই বাপির মৃত আত্মার দেখা যে আমি এইরকম ব্রহ্মমুহূর্তে পাবো এতে আর আশ্চর্যের কি আছে !!

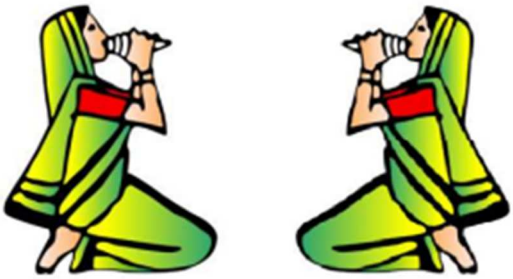

হেঁশেল থেকে

শক্তপোক্ত শুক্তো

মৌসুমী বিশ্বাস

উপকরণ

- উচ্ছে ৪ টে
- কাঁচকলা ২ টো
- বেগুন ২ টো
- সজনে ডাঁটা ৪ টে
- রাঙ্গা আলু ২ টো
- শিম ৪ টে
- কুকমি শুক্তো মশলা ২ চামচ
- বরবটি ৫০ গ্রাম
- বড়ি ৭-৮ টা
- ঘি ১ চামচ
- চিনি সামান্য
- তেল ১ চামচ

প্রণালী:

সব সবজি প্রথমে ডুমো করে কেটে সেদ্ধ করে নিতে হবে। কড়াতে তেল গরম হলে প্রথমে বড়ি ও পরে উচ্ছে দিয়ে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এবারে সবজি দিয়ে আঁচ কমিয়ে নরম করে ভেজে তুলতে হবে। যেন বেশি ভাজা না হয়। নরম হলে আন্দাজ মতো জল দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে। সামান্য নুন, শুক্তো মশলা, উচ্ছে ও বড়ি দিতে হবে। ফুটে উঠলে অল্প চিনি ও ঘি দিয়ে দরকার মতো ঝোল রেখে নামিয়ে নিতে হবে।

ক্ষীর সেমুই ঝুড়ি

উর্মিতা পায়রা

উপকরণ:

- সিমুই ৫০ গ্রাম
- কনডেন্স মিল্ক ৫০ গ্রাম
- চিনি ২০ গ্রাম
- দুধ এক কাপ
- চেরি সাজানোর জন্য
- কিসমিস ২০ গ্রাম
- কাজু ২০ গ্রাম
- এলাচ দুটো
- ঘি ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

কড়াইতে ঘি গরম করে সিমুই হালকা ভেজে নিতে হবে। অল্প চিনি,অর্ধেক কনডেন্স মিল্ক,এলাচ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিয়ে হালকা ঠান্ডা হতে দিতে হবে।ছোট বাটিতে ঘি ব্রাশ করে,সিমুই হাতে সাহায্যে চেপে চেপে বাটি করে কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিলে সিমুই গড়া বাটি খুব সহজেই বাটির থেকে বেরিয়ে আসে।ক্ষীর বানানোর জন্য দুধ ফুটিয়ে নিয়ে একে একে চিনি,অল্প কিসমিস,কাজু, এলাচ,বাকি অর্ধেক কনডেন্স মিল্ক দিতে হবে।ক্ষীর ঠান্ডা করে নিতে হবে। সেমাই এর বাটিতে ক্ষীর কিসমিস চেরি দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

নল্লি নিহারি

পৌলমী ঘোষ

উপকরণ:

- মটন গুটখা বা নল্লি - ১/২ কেজি (বঙ্গবাজার বা অন্যান্য ভারতীয় দোকানগুলিতে পাওয়া যায়)
- আদা-রসুন বাটা – ১ টেবিল চামচ
- দই – ১/৪ কাপ
- লাল লঙ্কা গুঁড়া – ১ - ১ ১/২ চা চামচ
- হলুদ গুঁড়া – ১/২ চা চামচ
- ধনে গুঁড়া – ১/২ টেবিল চামচ
- জিরা গুঁড়া – ১/২ চা চামচ
- গরম মশলা গুঁড়া – ১/২ চা চামচ
- গোটা গরম মশলা (দারুচিনি ১-২ টুকরা, ছোট এলাচ ২টি, লবঙ্গ ৪টি, তেজপাতা ২টি)
- ময়দা – ১ ১/২ টেবিল চামচ (ঘন করার জন্য)
- লবণ – পরিমাণমতো
- ঘি – ৩ টেবিল চামচ
- তেল – ১/৪ কাপ
- জল – প্রয়োজনমতো

সাজানোর জন্য:

- কুচি করা আদা - ১/৪ কাপ
- কাঁচা লংকা কুচি - ২ টি
- ধনেপাতা - ১/৪ কাপ
- লেবু - ২টি

নিহারি মশলার জন্যে উপকরণ

- মৌরি - ১ টেবিল চামচ
- গোটা ধনে - ১/২ টেবিল চামচ
- গোটা জিরা - ১/২ টেবিল চামচ
- জায়ফল - ১/২ টেবিল চামচ
- জয়ত্রী - ১ টি
- ষ্টার আনিস বা তারকা মৌরি বা চক্রফুল - ২ টি
- বড়ো এলাচ - ১ টি
- ছোট এলাচ - ৫ টি
- লবঙ্গ - ৫ টি
- দারচিনি - ১ টি
- পিপলী - ১ টি (আমাজন জাপান এ পাওয়া যায়)
- গোটা গোল মরিচ - ১ টেবিল চামচ

(প্যাকেট মশলা পাওয়া যায় কিন্তু স্বাদ একটু আলাদা হবে):

প্রস্তুত প্রণালী:

নিহারি মশলা তৈরী

- নিহারি মশলা বা উপকরণগুলি নন স্টিক প্যান এ হালকা করে গরম করে নিতে হবে
- এরপর মিক্সিতে মিহি গুঁড়ো করে আলাদা করে রেখে দিন
- আদা ও রসুন মিক্সিতে ভালো করে পিষে নিন এবং আলাদা করে পাত্রতে রেখে দিন

মটন প্রস্তুত প্রণালী

- একটি ভারী তলার পাত্র বা লোহার প্যান গরম করে তাতে তেল ও ঘি দিন
- তেল গরম হয়ে গেলে তাতে গোটা গরম মশলা দিয়ে নেড়ে নিন
- গরম মশলার গন্ধ বের হওয়া শুরু হলে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন।
- মটনের নল্লি পিস ঢেলে ভালোভাবে নেড়ে নিন যতক্ষণ মটন এর কালার চেঞ্জ না হয়
- দই, লাল মরিচ, হলুদ, ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া ও বাড়িতে তৈরী নিহারি মশলা দিয়ে মাঝারি আঁচে কষাতে থাকুন এবং মটন থেকে তেল বের হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন
- মাংস থেকে তেল আলাদা হয়ে এলে আন্দাজ মতো গরম জল দিন এবং নাড়তে থাকুন
- এরপর প্যান এ ঢাকনা দিয়ে কম আঁচে ২-৩ ঘন্টা রান্না করুন (মাংস নরম ও ঝোল ঘন হওয়া পর্যন্ত), তবে মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে দেখে নিন

ঝোল ঘন করার পদ্ধতি

- ময়দা জল এ মিশিয়ে ঝোল এ ঢেলে দিন, এতে ঝোল ঘন হবে
- লবণ ঠিকমতো হয়েছে কিনা একবার দেখে নিন
- শেষে গরম মশলা ছড়িয়ে দিয়ে একবার নাড়িয়ে নিন
- নিহারি প্রস্তুত হয়ে গেলে কোনো বড়ো বাটি বা পাত্রে তুলে রাখুন

পরিবেশন:

- সাজানোর জন্যে রাখা মাঝারি করে কাটা লেবু একসাথে মিশিয়ে দিন
- পরিমাণ মতো নিহারি পাত্রে নিয়ে তার উপর আদা কুচি, লঙ্কা কুচি এবং ধনে পাতা ছড়িয়ে দিন
- গরম গরম নিহারি পরিবেশন করুন নান, রুমালি রুটি বা ভাতের সঙ্গে

Looking Back at IBCAJ Events 2024-25

Kids' Sit & Draw competition

Durga Puja 2024

Durga Puja 2024

Knowledge Olympics 2024

SDG counter

Sumida Multi Culture Exchange event

Saraswati Puja 2025

Anandadhara 2025

Anandadhara 2025

Nabobarsho Celebration

Camping

Yoga Day celebration

Core Committee for the year 2025-26	
Mr. Swapan Biswas	President
Mr. Supriyo Dutta	Vice-president
Mr. Naba Kumar Ghosh	Advisor
Mr. Subhabrata Mukherjee	Advisor
Mrs. Ruma Mandal	Jt. Secretary
Mrs. Oeindrila Debnath	Jt. Secretary
Mr. Sugam Ghosh	Finance Coordinator
Mr. Mrinmoy Das	Cultural Coordinator
Mrs. Sukanya Misra	Cultural Coordinator
Mr. Pallab Sarkar	IT Coordinator
Mr. Suchhando Chatterjee	Event Coordinator
Mr. Bhaskar Dasgupta	Media Coordinator
Mr. Subhasis Pramanik	Magazine Coordinator

IBCAJ Members list	
1. Mr. Amit Chakraborty	**2. Mr. Amlan Debnath**
3. Mrs. Antara Sen	**4. Mr. Anirban Nandy**
5. Mr. Ashim Payra	**6. Mr. Biplab Chakraborty**
7. Mr. Bhaskar Dasgupta	**8. Mr. Bhaskar Deb**
9. Mr. Durjay Biswas	**10. Mr. Dipankar Biswas**
11. Mr. Joydip Ghosh	**12. Mr. Kaustav Bhattacharyya**
13. Mr. Manish Kothari	**14. Mr. Mrinmoy Das**
15. Mr. Naba Kumar Ghosh	**16. Mr. Pallab Sarkar**
17. Mr. Punit Tyagi	**18. Mr. Rajib Shaw**
19. Mrs. Ruma Mandal	**20. Mr. Sanjib Chatterjee**
21. Mr. Sanjib Sanyal	**22. Mrs. Somdatta Banerjee**
23. Mr. Somsubhra Ghosh	**24. Mr. Soumyadeep Mukherjee**
25. Mr. Soumyajit Paul	**26. Mr. Srinesh Kundu**
27. Ms. Subarna Maity	**28. Mr. Subhabrata Mukherjee**
29. Mr. Subhajit Hizly	**30. Mr. Subhasis Pramanik**
31. Mr. Subrojyoti Bosu	**32. Mr. Suchhando Chatterjee**
33. Mr. Sudipta Das	**34. Mr. Sudip Saha**
35. Mr. Sugam Ghosh	**36. Mrs. Sukanya Misra**
37. Mr. Supriyo Dutta	**38. Mr. Swapan Kumar Biswas**

Agomoni 2025

Website : https://ibcaj.org/

Facebook : https://facebook.com/ibcaj

Instagram ID : ibcajapan

Contact us at info@ibcaj.org

Publisher : India (Bengal) Cultural Association Japan

© All rights are reserved